লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

আহ্‌মদী

বুলেটিন

মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) সংখ্যা

২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ ঈসাব্দ

সম্পাদকীয়

মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবসের তাৎপর্য

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সব সময় স্বীয় গৃহীত বান্দার সমর্থনে এমন সব নিদর্শন প্রদর্শন করে থাকেন, যা সর্বদিক থেকেই আজিমুশ্বান ও ব্যতিক্রমী হয়ে থাকে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস এমনই এক মহা দির্শন।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) আল্লাহ্তায়ালার কাছে একটি নিদর্শন চাইলে আল্লাহ্ তাঁকে জানান "**তেরি উকদাকুশী হুশিয়াপুর মে হোগী।**" এই ইলহাম পেয়ে তিনি একান্তে ইবাদত করার জন্য হুশিয়ারপুরে চলে যান। নিরিবিলি পরিবেশে সেখানে তিনি চল্লিশ দিন চিল্লাকাশি করেন। এরপর আল্লাহ্ পাক তাঁকে এক মহান পুত্রের সুসংবাদ দেন। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) আল্লাহ্ কর্তৃক সুসংবাদপ্রাপ্ত পুত্রের সংবাদ জনসাধারণকে আগাম জানানোর জন্য একটি ইশতেহার প্রণয়ন করেন। "সবুজ ইশতেহার" খ্যাত সেই প্রচারপত্রে তিনি সার্বিক বিষয়, সেই পুত্রের প্রজ্ঞা-মেধা ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) হলেন সেই প্রতিশ্রুত পুরুষ। এবং যেহেতু তিনি ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারি নিজেকে মুসলেহ্ মাওউদ হিসাবে দাবী করেন তাই আমরা প্রতিবছর ২০শে ফেব্রুয়ারি মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস হিসাবে পালন করে থাকি। এই প্রতিশ্রুত পুরুষ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেছিলেন- "**জ্যোতিঃ আসছে-জ্যোতি! খোদা তাঁকে তাঁর সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন রূহ্ ফুঁকে দিব এবং খোদার ছায়া তাঁর শিরে থাকবে। সে শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বন্দীদের মুক্তির উপায়স্বরূপ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে।**" আমরা যদি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর সমস্ত জীবন পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা তাঁকে দেখতে পাই জ্যোতি হিসাবে। মানুষের জন্য এক পরম আশ্রয় ছিলেন তিনি। মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে খেলাফতের আসনে সমাসীন হয়ে ৫১ বৎসর খিলাফতের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে কাদিয়ান জলসায় "শিরকের মুলোৎপাটন" বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। কিশোর বয়সে বের করেন "তাশহিযুল আযহান" পত্রিকা। বিশ্বব্যাপী আহমদী জামাতের কার্যপরিধিকে বিস্তৃত করেন। তাহরিকে জাদীদ, ওয়াক্ফে জাদীদ, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আতফালুল আহমদীয়া, খোদ্দামুল আহমদীয়া, আনসারুল্লাহ্, নাসেরাতুল আহমদীয়া, মজলিসে শূরা প্রভৃতি তাঁরই অমর কীর্তি সমূহের অংশ। দশখন্ডে পবিত্র কুরআনের তফসির (তফসিরে কবীর) ও তফসীরে সগীর ছাড়াও তিনি অসংখ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। খিলাফতের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তিনি হযরত ওমর (রাঃ) এর মতই সাহসী পদক্ষেপ নেয়। তাঁর ভূবন মোহন কার্যকলাপের জন্য তাঁকে "ফযলে ওমর" হিসাবে অভিহিত করা হয়। তিনি (রাঃ) তাঁর এক নযমে লিখেছেন-

"আকল কা ইহা পার কাম নেহি উওহ্ লাখোঁ ভি বে-ফায়দে হ্যায়
মকসুদ মেরা পুরা হো আগার মিল জায়ে মুযে দিওয়ানে দো।"

অর্থাৎ- **এখানে বুদ্ধিমানের কোন প্রয়োজন নেই,**
সেগুলো সংখ্যায় লাখ হলেও অর্থহীন
মনোবাসনা আমার পূর্ণ হবে যদি দুইজন দিওয়ানা পাওয়া যায়।

বর্তমান যুগের এই প্রেক্ষাপটে ও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কার্যক্রমের প্রবাহমানতায় আমাদেরকে আজ ভেবে দেখতে হবে এই মহান ব্যক্তিত্বের কাঙ্ক্ষিত সেই দিওয়ানা আমরা হতে পেরেছি কি না? মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) হচ্ছেন জ্যোতি। আমরা কি পেরেছি আমাদের হৃদয়ের কপাটগুলো খুলে দিতে- যেন সেই জ্যোতির ছটা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে? পৃথিবীর সমস্ত বাধাকে ভেঙ্গে আমাদের এই হৃদয় অর্গল অবমুক্তির মাঝেই নিহিত রয়েছে জগতের মঙ্গল, পৃথিবীর কল্যাণ ও বিশ্ব মানবতার মুক্তি। মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবসের আহ্বান হোক-আত্ম জিজ্ঞাসার আয়নায় নিজেকে পরখ করে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন। আমীন।

❐ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

সূচীপত্র পৃষ্ঠা নং

- কুরআন শরীফ ৩
- হাদিস শরীফ ৪
- অমৃত বাণী ৫
- **জুমুআর খুতবা ঃ** দাওয়াত ইলাল্লাহ্ প্রত্যেক আহমদীর একটি মৌলিক দায়িত্ব
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) ৬-১০
  অনুবাদ ঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
- **জুমুআর খুতবা ঃ** তাকওয়ার গুরুত্ব
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আইঃ) ১১-১৩
  অনুবাদ ঃ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান
- মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মহান ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী ১৪
  অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
- হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক
  শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন ১৫-১৭
- কবিতা-মুক্তি ঃ শরীফ আহমদ আফ্রাদ ১৭
- আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলী ১৮-২১
  মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
- আহমদীয়াত ঃ ইয়ানী হাকীকী ইসলাম ২২-২৩
  মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)
- বঙ্গীয় আহমদী জামাতের প্রতি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বাণী ২৪-২৫
- হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর স্মরণে ২৬-২৮
- সহশিক্ষা ২৯
- ধর্মের দৃষ্টিতে কর্ম ঃ মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয় ৩০-৩১
- এম. টি. এ. ডাইজেষ্ট ঃ ডক্টর আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক ৩২
- সংবাদ ৩৩-৩৫

প্রচ্ছদ ঃ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল্ মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

কুরআন শরীফ

সূরা আত্ তাওবা-৯

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮। আল্লাহ্‌র মসজিদগুলোকে[১১৬৯] কেবল সে-ই আবাদ করতে পারে, যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় আর আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, অতএব এরাই সম্ভবত আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে হেদায়াতপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯। তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণকে সে ব্যক্তির (কাজের) সমতুল্য বলে মনে করেছ, যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করে? আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এরা কখনও সমান নয় আর[১১৭০] আল্লাহ্ যালেম লোকদেরকে কখনও হেদায়াত দেন না।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করেছে, এরা আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদায় অনেক বড় এবং এরাই সফলকাম।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾

২১। এদের প্রভু-প্রতিপালক এদেরকে নিজ পক্ষ থেকে এক রহমত, সন্তুষ্টি এবং এমন সব জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যাতে এদের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামত রয়েছে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২২। এরা তাতে চিরকাল থাকবে; নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে এক মহা পুরস্কার।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের পিতা ও তোমাদের ভাইয়েরা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে প্রাধান্য দিলে তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না,[১১৭১] আর তোমাদের মাঝে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তারাই যালেম।

১১৬৯। আল্লাহর মসজিদ দ্বারা ১৯ আয়াতে বর্ণিত 'পবিত্র মসজিদ' বুঝায়। কারণ পবিত্র মসজিদ বা কা'বা ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং পৃথিবীর সকল মসজিদের আদর্শরূপ।

১১৭০। কা'বার বাহ্যিক এবং বাস্তব উপকার নিজ স্থানে যদিও খুবই প্রশংসনীয়, তবু এর আধ্যাত্মিক উপকারের সঙ্গে তা তুলনীয় হতে পারে না, যা কেবল একজন মুসলমানই অর্জন করতে পারে। তফসীরাধীন আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম এই যে, ইসলাম এর আদেশসমূহের বাহ্যিক প্রচলিত প্রথা বা আচার থেকে এর অন্তরালে নিহিত মৌলিক আত্মিক চেতনার প্রতিই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নবী করীম (সঃ) এর এক হাদিসে আছে যে, মু'মিনের জীবন কা'বা থেকে অধিকতর পবিত্রতার অধিকারী (মাজাহ্)।

১১৭১। এ আয়াত কাফিরদের সেই দলের প্রতি নির্দেশ করে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে সক্রিয় শত্রুতা করতো এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে কঠোরভাবে প্রচেষ্টা চালাতো।

হাদীস শরীফ

তেলাওয়াতে কুরআন

কুরআন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ
قُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝

অনুবাদ ঃ তুমি সূর্য হেলে যাওয়ার পর হতে রাত্রির ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর; প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহ্‌র নিকট) নিশ্চয় গ্রহণীয়। *সূরা বনী ইসরাঈল-৭৯*

হাদিস ঃ *আন আবী সাঈদ আলখুদরি ইন্নাহু ক্বালাসামে'তু রাসূলাল্লাহে সাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইয়াকুলু ইয়াখরুজু ফীকুম কাওমুন ইয়াক্বরাউনাল কুরআনা লা ইউজাবেযু হানাজেরাহুম।* বুখারী।

হযরত আবি সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে এমন এক গোত্রের সৃষ্টি হবে যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের হলকের (গলার) নীচে যাবে না, (অর্থাৎ হৃদয়ে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না) বুখারী।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌তায়ালা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য তাঁর শেষ শরীয়ত কুরআন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর নাযেল করেছেন। কুরআনের দাবী এই যে, ইহা সকল সমস্যার সমাধানকারী। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের দিক-নির্দেশনার জন্য কুরআন আবশ্যকীয়। বর্তমান জগতে অবক্ষয়ের যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে কুরআন শিক্ষার উপর আমল করা ছাড়া বিকল্প নেই।

আরবের নিকৃষ্ট সেই জাতি যারা বর্বরতা ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল– কুরআন নূর ও জ্যোতি হয়ে তাদের মুক্তির পথে নিয়ে এল। সেই জাতিকে আকাশের নক্ষত্র বানিয়ে দিল, আর তাদের সম্বন্ধে ঘোষিত হলো **বেআইয়েহিম ইকতানায়তুম ইহতাদায়তুম** তাদের মধ্যে যাকেই অনুসরণ করনা কেন হেদায়াত পেয়ে যাবে। আজ সেই জাতি যাদের শ্রেষ্ঠ জাতি বলে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন কেন অধঃপতিত? কেন লাঞ্ছিত? গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে যে, তার একমাত্র কারণ কুরআনের শিক্ষা হতে বিমুখতা। একজন মুসলমান ও কুরআন একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কুরআন ব্যতিরেকে কল্যাণ লাভ সম্ভব নয়। আজ আবার ইসলামের সূর্যকে মধ্য গগনে আলো বিচ্ছুরিত করতে দেখতে হলে কুরআনকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা ফজরের সময়ে কুরআন পাঠকে অত্যন্ত কল্যাণময় বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আজ কয়টি ঘরে কুরআনকে বিগলিত চিত্তে পাঠ করা হয়? অল্প সংখ্যক ঘরেই তা করা হয়। হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে একটি দল এমন হবে যারা কুরআন তো পাঠ করবে কিন্তু তা গলার নিচে যাবে না অর্থাৎ কুরআনের উপর আমল থাকবে না। কুরআন হৃদয়ের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। কারণ এই যে, কুরআনের শিক্ষা যতক্ষণ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত না হয় ততক্ষণ কুরআন পাঠ শুধু বুলি আওড়ানো ছাড়া আর আর কিছুই নয়। আসুন, নিজেদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে কুরআনকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়াস চালাই। কুরআনকে প্রজ্ঞা ও হেদায়াতের প্রধান উৎস জেনে পাঠ করি। প্রতিদিন কুরআনের তেলাওয়াত করি ও তার মর্মবাণীকে বুঝি। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সবাইকে কুরআনের মর্মবাণী বুঝবার ও এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

বয়াতের তাৎপর্য

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

"জেনে রাখা উচিত যে, কেবলমাত্র মৌখিক বয়াতের (অঙ্গীকারের) কোনই মূল্য নেই যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সাথে এর উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা না হয়" (কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ২০)।

"বয়াতের অর্থ বিক্রয় করে দেয়া, যেভাবে কোন দ্রব্য বিক্রয় করে দেয়ার পর এর সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। এটা ক্রেতার অধিকার। সে যা চাইবে তা-ই করবে। এভাবেই যার নিকট তুমি বয়াত করছ যদি তার আদেশের ওপর ঠিক ঠিক না চল তবে কোন উপকার লাভ করবে না" (মলফূযাত, খন্ড ৫, পৃঃ ২৮১)।

"বয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা উচিত এবং এর অনুগমন করা উচিত। বয়াতের তাৎপর্য এই যে, বয়াত গ্রহণকারী তার মাঝে সত্যিকারের পরিবর্তন এবং নিজ হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি করবে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য জেনে নিজের জীবনকে একটি পবিত্র উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করে দেখাবে। যদি এরূপ না হয় তবে বয়াতে কোন লাভ নেই; বরং এ বয়াত তার জন্য আরো আযাবের কারণ হবে। কেননা, অঙ্গীকার করার পর জেনে বুঝে ও সজ্ঞানে নাফরমানী করা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক" (মলফূযাত, ১০ খন্ড, পৃঃ ৩৩)।

"বয়াত যদি অন্তর হতে না করা হয় তবে এর কোন ফল নেই। আমার বয়াতে খোদা হৃদয়ের অঙ্গীকার চান। অতএব, যারা খাঁটি অন্তঃকরণে আমাকে গ্রহণ করে এবং নিজেদের পাপ হতে খাঁটি তওবা করে ক্ষমাশীল ও দয়ালু খোদা তাদের পাপ সমূহ নিশ্চয় ক্ষমা করে দেন এবং তারা এরূপ হয়ে যায় যেন মায়ের গর্ভ হতে বের হয়েছে। তদবস্থায় ফিরিশ্‌তারা তাদেরকে রক্ষা করে" (মলফূযাত, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২৬২)।

"তোমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব এ অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সকল প্রকার পাপ হতে বাঁচতে থাক। এতদ্ব্যতীত এ অঙ্গীকারে মজবুত থাকার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়া করতে থাক। তিনি নিশ্চিতরূপে তোমাদেরকে আশ্বস্তি ও শান্তি দিবেন এবং তোমাদের পদদ্বয়কে দৃঢ় রাখবেন। কেননা, যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তঃকরণে খোদাতায়ালার নিকট চায়–তাকে দেয়া হয়। আমি জানি যে, তোমাদের মাঝে কেউ কেউ এমনও আছে, যাদেরকে আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আমি কি করব। এ পরীক্ষা নতুন নয়। যখন খোদাতায়ালা কাউকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন এবং কেউ তাঁর দিকে চলে তখন পরীক্ষার মাঝে দিয়ে যাওয়া তার জন্য জরুরী হয়। পৃথিবী ও এর সাথে সম্পর্ক অস্থায়ী ও নশ্বর। কিন্তু খোদাতায়ালার সাথে আমাদের সম্পর্ক সর্বকালের কাজেই তাঁর দিক হতে মানুষ কেন মুখ ফিরাবে?" (মলফূযাত, খন্ড ৭, পৃঃ ২৩৬)।

পরীক্ষা

"যেভাবে পূর্বের মুমিনদের পরীক্ষা হয়েছে, তদ্রূপেই ইহা নিশ্চিত যে, বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ-বিপদের দ্বারা তোমাদেরও পরীক্ষা হবে। অতএব সাবধান হও যেন এরূপ না হয় যে, তোমরা হোঁচট খাও। যদি আকাশের সাথে তোমাদের সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকে তবে পৃথিবী তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তোমরা কখনো নিজেদের ক্ষতি সাধন কর তবে তা নিজেদের হাতেই করবে, দুশমনের হাতে নয়। যদি তোমাদের সকল জাগতিক সম্মান চলে যেতে থাকে, তবে খোদা তোমাদেরকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দান করবেন। অতএব, তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করো না। ইহা নিশ্চিত যে, তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে এবং তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যাবে। অতএব এমতাবস্থায় তোমরা মনক্ষুন্ন হয়ো না। কেননা, তোমাদের খোদা তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখেন যে, তোমরা তার পথে দৃঢ়পদ আছ কি না। যদি তোমরা চাও আকাশের ফিরিশ্‌তারাও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা মার খেয়ে খুশি থাক। এবং গালি শুনে শুকর কর। ব্যর্থতা দেখে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা খোদার শেষ জামাত। অতএব, ঐ পুণ্যকর্ম করে দেখাও, যা স্বীয় উৎকর্ষতায় চূড়ান্ত পর্যায়ের হবে। তোমাদের মাঝে যে কেউ অলস হয়ে যাবে তাকে এক অপবিত্র বস্তুর ন্যায় জামাত হতে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হবে এবং সে আক্ষেপের সাথে মরবে। সে খোদার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩১-৩২)।

দাওয়াত ইলাল্লাহ প্রত্যেক আহমদীর একটি মৌলিক দায়িত্ব।

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ,খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ৮ অক্টোবর, ২০০৪ইং তারিখে বায়তুর রহমান, গ্লাসগো, (স্কটল্যান্ড) ইংল্যান্ডে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহার পর সূরা নাহলের ১২৬ নং আয়াত তেলাওয়াত ও তরজমা পড়ে হুযূর (আইঃ) খুতবা এরশাদ করেন।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

অনুবাদ ঃ তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সবচেয়ে উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাদেরকে সবচেয়ে বেশি জানেন। যারা তার থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, এবং তিনি তাদেরকেও খুব জানেন যারা হেদায়াত প্রাপ্ত।

এ আয়াত শুনেই আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে আজকে কোন বিষয়ে কথা বলব। কয়েক মাস পূর্বেও এ বিষয় তথা দাওয়াত ইলাল্লাহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু বার বার বলতে কোন বাধা নাই- এটা তো যে কোন আহমদীর মৌলিক বা প্রধান কাজ। এ বিষয়ে যতবার বলা হোক না কেন, তবুও কম বলা হবে। লন্ডন থেকে চলার সময় আমার মনে হয়েছিল যে, দেশের এ অংশে (স্কটল্যান্ডে) জামাতের সংখ্যা অনেক অল্প, এদিকে আমাদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কিছু কিছু মানুষ ইদানিং (অ্যাসাইলম) Assylum নিয়ে এ অঞ্চলে এসে থাকছে। অনেকেই এসেছে। ফলে বিগত চার বছরে আপনারা সংখ্যায় দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছেন। আপনারা যদি সঠিকভাবে কাজ করেন, অর্থাৎ দাওয়াত ইলাল্লাহ করেন তাহলে পার্থিবভাবে উপার্জনের সাথে সাথে আল্লাহ্র ফযলও লাভ করতে পারবেন। সমগ্র ব্রিটেনে বরং পশ্চিমাদেশগুলোতেই এ বিষয়ে অর্থাৎ দাওয়াত ইলাল্লাহ্র ময়দানে খুব স্বল্পতা আছে, যেভাবে হওয়া উচিত সেভাবে হচ্ছে না। কিন্তু আমার মনে হলো, স্কটল্যান্ডে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আপনারা যারা এ অঞ্চলে বসবাস করছেন, আপনারা মাঠে নামুন। এ বিষয়ে আজ আপনাদেরকে কিছু বলতে চাই। রাস্তায় আসার পথে ব্রিটেনের আমীর সাহেব আমাকে জানালেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ) **ফাইভে দি টেন্থ** এর প্রথম খুতবা স্কটল্যান্ডেই দিয়েছিলেন। এখানে যখন তিনি এ মসজিদের উদ্বোধন করেছিলেন। আমার মনে হলো, দেখা দরকার হুযূর (রহঃ) সেদিন কি বলেছিলেন, আজ থেকে ১৯ বছর পূর্বে হুযূর কি উপদেশ দিয়েছিলেন?

হযরত খলীফা রাবে (রহঃ) ১০ মে ১৯৮৫ইং তারিখে সেই খুতবা দিয়েছিলেন। আমি দেখেছি, হুযূর (রহঃ) আল্লাহ্তায়ালার আনীত ফযল সমূহের বিবরণ দিয়েছেন। কিভাবে কিভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে, আশা নিরাশার মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসে এ মিশন হাউজ ক্রয় করা হয়েছিল। তারপর হুযূর (রহঃ) সূরা ফাতেহার আলোকে উপদেশ দিয়েছিলেন-'আমরা একটি বীজ বপণ করে যাচ্ছি-এ বীজ পরবর্তীতে চারা গাছ হবে, তারপর ফুলে ফুলে সুশোভিত বৃক্ষে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ্। এ উদ্বোধনীর মাধ্যমে আমরা প্রথম ভিত্তি ইট রাখছি। ভবিষ্যতে বৃহদাকার প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে, যাতে অনেক বড় জনসংখ্যা বসবাস করবে। তারপর হুযূর বলেছেন, আজকের জুমুআর মধ্যে সকল আহমদী প্রতিজ্ঞা করবেন যে, আমরা আল্লাহ্র ইচ্ছামত জীবন যাপন করব এবং মৃত্যু বরণ করব এবং ইসলাম ধর্মের বাণীকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রচার করব এবং এটা দেয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। নিজের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে হবে। তারপর তিনি স্কটল্যান্ড জামাতকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, আপনারা নিজেদেরকে (ওয়াক্ফ) উৎসর্গ করবেন ইসলাম প্রচারের জন্য এবং নিজেদেরকে এর মধ্যে পুরোপুরি ঢেলে দিবেন। আজ আপনারা সিদ্ধান্ত নিবেন যে, স্কটল্যান্ডকে আল্লাহ্ ও তাঁর ধর্মের জন্য জয় করতেই হবে।

অতপর, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ)-এর খুতবা পেয়ে আমি আরো খুশি হলাম যে, তিনি যা বলেছিলেন যাত্রার শুরুতে আমারও সে কথা বলারই ইচ্ছা জেগেছিল। যে মনে হচ্ছে আল্লাহ্তাআলার ইচ্ছা এটাই যে, আমরা দেশের এ অংশে এখন দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজকে আরো গতিশীল করি– বেগবান করি। আমরা চেষ্টাও করব, দোয়াও করব যেন নিজেদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারি। তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ বরকত দিবেন। এখন পর্যন্ত এখানে মাত্র বারজন আহমদী আছে। শেষ বয়াত এ বছর গত মার্চ ২০০৪ইং মাসে হয়েছিল-একজন মহিলা ও তার তিন মেয়ে বয়াত করেছিলেন। তার মানে এর পূর্বে মাত্র ৮ জন আহমদী এখানে ছিলেন। আমি বিভিন্ন স্থানে গেলাম এবং এদের মধ্যে যে শালীনতা ও ভদ্রতা লক্ষ্য করলাম তাতে আমি আশা করছি যে, যদি আমরা যথাযথভাবে চেষ্টা করি তাহলে এখানে আহমদীয়াতের বিস্তার ঘটবে ইনশাআল্লাহ্। ১৯৮৫ইং এর তুলনায় আপনাদের সংখ্যা এখন অনেক বেশি। আপনারা যদি চেষ্টা করেন তাহলে ভাল ফলাফল সৃষ্টি না হবার কোন কারণ নেই। খাঁটি অন্তঃকরণে যে চেষ্টা করা হয় আল্লাহ্তায়ালা সে চেষ্টাকে কখনও বৃথা যেতে দেন না। আপনাদেরকে হিকমত বা প্রজ্ঞার সাথে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ্তায়ালা এ আলোচ্য আয়াতে একথাই বলেছেন যে, প্রজ্ঞার সাথে বুদ্ধিমত্তার সাথে ভাল ভাল উপদেশের

মাধ্যমে দাওয়াত ইলাল্লাহ্ করতে হবে। নতুন নতুন পথ বের করতে হবে, তাহলে সাফল্য আসবে। এখানকার মানুষ সাধারণত সহজ সরল প্রকৃতির দেশের অন্য অংশের তুলনায় এখানকার মানুষ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ রাখে। এরা যখন দেখবে যে, আপনারা খুব ভাল ধর্মপরায়ণ, তখন তাদের অন্তরে প্রশ্ন জাগবে। আজকাল মৌলভী সাহেবরা তাদের উন্মাদনার মাধ্যমে ইসলামের যে ভয়ঙ্কর চিত্র পৃথিবীর মানুষের সামনে তুলে ধরেছে, তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে, আসল ইসলামের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নাই। আপনারা যখন আপনাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সদাচরণের মধ্যে দিয়ে মানুষের মন থেকে ঐ ভয়ানক চিত্র মুছে ফেলবেন। তখন তারা আস্তে আস্তে আপনার নিকটে চলে আসবে। তারা আপনাদেরকে অন্য সবার থেকে ভিন্ন রকম দেখবে। আপনারা যারা এখানে অ্যাসাইলম নিয়ে এসেছেন– নিজেদের কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে বাকী সময়গুলো এদের সাথে রাবেতার (সম্পর্ক স্থাপন) কাজ করুন। নির্ধারিত সময়ের উপরে আপনারা এখানে জাগতিক পেশাগত কাজ তো করতে পারবেন না। সুতরাং বাকী সময় রাবেতার কাজে ব্যয় করবেন। যদিও এখানে অন্যদের জন্যও ঐ একই আইন, বৃদ্ধদের সাথে কথা বলতে পারেন; উপহার নিয়ে তাদের সাথে দেখা করবেন, তাদের কথা শুনবেন, সমবেদনা দেখাবেন। পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে এরা বড় বঞ্চিত একটা শ্রেণী। তাদের আত্মীয় স্বজনরা আছে; ছেলেমেয়েরা এসব বৃদ্ধদের গৃহ ছেড়ে চলে যায়-এদের কোন খোঁজ খবর রাখে না। এরা "বৃদ্ধ আশ্রমে" (Old People House)-এ থাকে। অনেকের কথা শুনেছি, বহু সপ্তাহ তাদের ছেলেমেয়েদের দেখা পায় না। এসব বৃদ্ধদের সাথে আপনারা যখন রাবেতা করবেন, তাদের প্রতি মাসে সমবেদনা প্রকাশ করবেন, তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে আপনারা আপনাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করবেন। বুঝতেই পারবেন না- অনায়াসে আপনাদের ভাষা ভাল হয়ে যাবে। এভাবে হয়ত এদের আত্মীয়দের সাথেও রাবেতা হয়ে যাবে। এভাবে রাবেতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এমন আরো অনেক উপায় আছে-যেভাবে আপনারা চেষ্টা করলে, ইচ্ছা থাকলে রাবেতা করতে পারবেন। আপনাকে সময় ও পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে বের হতে হবে, সময় ব্যয় করতে হবে। প্রতিবেশির সাথে সুসম্পর্ক, তাদের সাথে সহানুভূতি, তাদের উপকার করে দেয়া তাদের বিশেষ দিনগুলোতে, আপনাদের যেমন ঈদের খুশির দিনে (অনেকে করেন অনেকে করেন না) তাদের জন্য উপহার নিয়ে যান। তাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসুন, আপ্যায়ন করুন।

আমাদের সাধারণ অভ্যাস এই যে, বিশেষ একদিন, মাসে একদিন বা দু'মাসে একদিন 'তবলীগ দিবস' পালন করা হয়। অথবা বছরে দু'একবার দিন বা সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। সেদিন কিছু লিটারেচার বিতরণ করা হয় এবং ধরে নেয়া হয় যে, কর্তব্য পালন হয়ে গেল। আমার দৃষ্টিতে এ রকম করা ঠিক আছে, কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট নয়। এতটুকু করেই এতে নির্ভর করা যায় না যে কর্তব্য পালন হয়ে গেছে। আপনারা যখন কাউকে একবার লিটারেচার দেন তারপর তাদের সাথে বরাবর যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। নতুবা যা খরচ করলেন তা বিফল হয়ে যাবে। যতদিন তাদের আগ্রহ থাকবে ততদিন বার বার করে কাছে যাবেন। তার পছন্দ মত বই পুস্তক দিবেন-পড়াবেন।

আমি যেমন বললাম, মোল্লারা ইসলামের সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছে তার সংশোধনের এবং সঠিক ইসলামী তালীম উপস্থাপনের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (রাঃ) এর ভাষায় বই পুস্তক এ দেশের মানুষের হাতে দিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এক বা দুই পাতার লিফলেট আকারে পৌছানো প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর দাবীও মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। অবস্থা বিবেচনা করে পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে ব্যক্তি বিশেষে বুদ্ধি মত্তার সাথে প্যামফ্লেট বিতরণ করা উচিত কিন্তু নিয়মিত ধারাবাহিকভাবে যথারীতি বিতরণ করা চাই যেন রাবেতা বা সম্পর্ক বহাল থাকে-অসাধারণ লিফলেট বা যা দেয়া হয়, কোন কোন স্থানে যেখানে কাজ হয়, সেখানে কিছু দিন তো কাজ করা হয় কিন্তু তারপর আর এ ধারা অব্যাহত থাকে না। রাবেতা (সম্পর্ক বা সেতুবন্ধন) কায়েম রাখা হয় না। আপনার ভাল কথা, সদুপদেশ বা পুণ্যের কথা, মূল্যবান জিনিস মানুষের উপর দু'এক ফোঁটা ছিটানো হয়। কিন্তু তারপর ধারাবাহিকতা বা প্রবাহ চালু থাকল না ফলত ঐ দু'এক ফোটা (রূহানী অমৃত সুধা) শুকিয়ে গেল। নিয়মিত, সময়ত, ঠিকমত, অনবরত যদি পড়তে থাকত ফোঁটার ফোঁটা–কিন্তু তা হয় না। আল্লাহ্‌তায়ালার এই নির্দেশের উপর আমল খুব কমই করা হয় যে, 'এমন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন কর-যেন তা অতি উত্তম হয়।

অতএব, কুরআনী আদেশ অনুসারে দাওয়াত ইলাল্লাহ্ করুন। বুদ্ধিমানের হিকমতের (প্রজ্ঞার) সাথে করুন, নিয়মিত করুন (ভেঙ্গে ভেঙ্গে নয়) ধীর গতিতে, শান্ত মেজাযে, একান্তভাবে করতে থাকুন। অন্যের আত্মসম্মানবোধের প্রতি নজর রাখুন। দলিল প্রমাণের জন্য সবসময় কুরআন শরীফ, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কিতাব থেকে উদ্ধৃতি পেশ করুন। তারপর, মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীর হয়, মানুষের জ্ঞানের পরিধিও ভিন্ন ভিন্ন হয়-সবদিকে খেয়াল রাখা উচিত। আল্লাহ্‌র নামে পবিত্র নিয়তে আপনি যখন কথা বলবেন, তখন যাকে বলবেন তারও উপলব্ধি ভিন্ন রকম হবে। পবিত্র নিয়তে আল্লাহ্‌র নামে কথা বললে এর প্রতিক্রিয়া খুব ভাল হয়। অন্তরে ব্যথা নিয়ে বেদনাহত হয়ে কথা বললে তা ক্রিয়া করে। আম্বীয়ায়ে কেরাম (আঃ) সকলেরই এই নীতি ছিল-যা দিয়ে তাঁরা পয়গাম পৌছাতেন। প্রত্যেকে তারা নিজের জাতিকে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকছি, ভাল কথার দিকে ডাকছি, পুণ্যের দিকে ডাকছি এবং এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাই না।" কুরআন থেকে আমরা এ কথাই জেনেছি।

আলোচ্য আয়াতে

> *আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, যদি তোমরা অক্লান্ত পরিশ্রম কর, বিরামহীন পরিশ্রম কর, আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে সমস্ত শক্তি ব্যয় কর, দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে থাক, তাহলে যারা সৎ-প্রকৃতির তাদেরকে তিনি তোমাদের সাথে সংযুক্ত করতে থাকবেন, ইনশাল্লাহ্।*

কারণ তিনি জানেন যে, কে হেদায়াতের পথে আসবে এবং কে আছে যে, সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে-পানির ফোঁটা যতই তার উপর থেকে ফেলবেন তা নিচে গড়িয়ে পড়ে যাবে; যার প্রকৃতি বদ / মন্দ, তার উপর কোনই প্রভাব পড়বে না। আজ কালকার মোল্লাদের মত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও 'আমি মানব না' বলতেই থাকবে। কিন্তু তোমাদের কাজ এই যে, তোমরা তাদেরকে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে যাও, তোমরা পুরো শক্তি ব্যয় করে বোঝাতে চেষ্টা করে যাও, তারপর আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দাও। তোমাদের কাজ দাওয়াত পৌছে দেয়া। আমি বলেছি, তোমরা হিকমতের (প্রজ্ঞার) সাথে পৌছাতে থাক-সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে দাওয়াত কর, বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্ যা বলেছেন, আমি সংক্ষেপে কিছু বললাম, তারপরই তোমরা বলতে পারবে, "ইন্নানী মিনাল মুসলিমিন।" অর্থ- আমি পুরোপুরি মুসলমান হয়েছি বা আত্মসমর্পন করেছি। নতুবা আত্মসমর্পন কিসের? দ্বীনকে পার্থিব জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি বলে যে দাবী; কিসের দাবী? যাহোক, আপনারা প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তারপর যেমন আমি

বলেছি, হিকমত বা প্রজ্ঞার কথা শেখার জন্য কুরআন পড়বেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কিতাব পড়ে কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যা আরো বেশি বিস্তারিত জানতে মনোযোগী হবেন। এ সম্পর্কে পূর্বেও বিস্তারিত খুতবা দিয়েছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ "যাকে উপদেশ দিতে হয় মুখে বলে উপদেশ দাও; একই কথা একভাবে বললে একজন শত্রু হয়ে যেতে পারে; অন্যভাবে বললে- বন্ধু হয়ে যেতে পারে। সুতরাং জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান আহসান" অনুসারে কাজ কর। [তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সবচেয়ে উত্তম] কথা বলার পদ্ধতির নামই আল্লাহ্তায়ালা হিকমত রেখেছেন। আরো বলেছেন ঃ "তিনি যাকে খুশি তাকে হিকমত দান করেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭০)। (আল হাকাম, ১০ মার্চ ১৯০৩ইং পৃঃ ৮)।

অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেমন বলেছেন, আমাদের কাজ হবে হিকমত অবলম্বন করা। নিজেদের বন্ধু-বান্ধবের পরিধি বাড়াতে হবে। তাহলে দেখবেন এক থেকে আর এক বন্ধুর পরিচয় বের হতে থাকবে। মানুষ যখন আপনাকে শান্ত মেজাজের মানুষ বলে জানবে, তখন পরিচয় বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সম্পর্ক দৃঢ় হতে থাকবে এবং ফলপ্রসূ হতে থাকবে।

কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখবেন; হেকমত এবং ভীরুতার মধ্যে পার্থক্য আছে। হেকমত অবলম্বন করতে হবে নিজের ধর্মের প্রতি সম্মানবোধকে (গায়রত) কায়েম রেখে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলছেন, "জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহ্সান"-এর উদ্দেশ্য এটা না যে, 'আমরা -বেশি নমনীয় হয়ে তোষামোদীপূর্ণ চাটুকারীতার মাধ্যমে অসত্যকে সমর্থন দিয়ে বসব। [তিরিয়াকুল কুলুব; রূহানী খাযায়েন, ১৫ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫]।

হেকমত অর্থ ভীরুতা প্রদর্শন করা নয়। এমন না যে, কাউকে কাছে টেনে আনার জন্য আমাদের শিক্ষার বিপরীত কথাকে হ্যাঁ বলে সমর্থন করতে হবে। যদি কেউ বলে যে,হযরত ঈসা আল্লাহ্র পুত্র, তখন আমরা চুপ করে থাকব যে, তাকে কাছে আনতে হবে। এটা তো তাহলে শির্ককে সমর্থন করা হলো। অথচ বহুভাবে জবাব দেয়া যেতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"স্মরণ রাখ, যে ব্যক্তি কঠোরতা প্রদর্শন করে-দ্রুত রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তার মুখ থেকে কখনও খেদমতের কথা বের হতে পারে না। এমন (ব্যক্তির) হৃদয়কে হেকমতের কথা হতে বঞ্চিত রাখা হয় যে তার প্রতিপক্ষের সামনে দ্রুত রাগান্বিত হয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। যে অশ্রাব্য, অভদ্র ভাষায় লাগামহীন কথা বলতে পারে এমন ঠোঁট (মুখ) পবিত্র সূক্ষ্ম জ্ঞানের উৎস (ঝর্ণা) লাভ করতে পারে না এবং তাকে বঞ্চিত করা হয়।"

অর্থাৎ যে রূঢ় এবং কর্কশ কথা বলতে পারে, তার মুখ থেকে ভাল কথা বের হয় না। "গযব (জ্বালাময়ী যন্ত্রণাদায়ক) এবং হেকমত একত্রিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি গযবের (অন্যের জন্য আযাব স্বরূপ বাক্য ব্যবহার করে) দাস তার বিবেক বুদ্ধি মোটা এবং সে সূক্ষ্ম কথা বোঝে না। তাকে কখনও কোন ময়দানে বিজয় বা (ঐশী) সমর্থন করা হয় না। গযব বা প্রচন্ড রাগ অর্ধেক উন্মাদনা-যখনই বৃদ্ধি পায় তখন পুরা উন্মাদ বা পাগল (বিবেকহীন) হয়ে যেতে পারে?" [মলফূযাত; ৩ খন্ড; ১০৪ পৃষ্ঠা]।

বর্তমানে আমাদের বিরোধীদের রাগ আমাদের বিরুদ্ধে উন্মাদনার সীমায় প্রবেশ করেছে। হযরত আলীর (রাঃ) একবার অন্তরের ইচ্ছা বা বাসনা কখনও এমন হয় যে, তখন সে কথা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে। আবার কখনও এমন হয় যে, কোন কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয় না। সুতরাং মানুষের অন্তরের অবস্থা বুঝে তার মধ্যে প্রবেশ কর; এমন সময় তুমি তোমার কথা তাকে বল যখন সে শুনতে প্রস্তুত থাকে। কারণ মানুষের অন্তর এমন যে, তাকে কোন কথা যদি জোরপূর্বক বুঝাতে বা শুনাতে চেষ্টা করা হয় তাহলে এটা অন্ধ হয়ে যায় (অর্থাৎ কবুল করতে অস্বীকার করে বসে)।" [কিতাবুল খারাজ; আবু ইউসুফ]।

এটা হলো হেকমতের কথা, কখনও পরিস্থিতি এমন হয় যে, তখন কথা বলা উচিত, যখন তার অন্তর সে কথা শুনতে প্রস্তুত হয়। এজন্য উত্তম পন্থা এটাই, আমি যেমন বললাম , নিজেদের পরিচয়ের বা সম্পর্ককে (রাবেতা) বৃদ্ধি করুন। ধীর স্থির হয়ে শান্ত মন নিয়ে বিরামহীনভাবে, ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রাবেতা করুন-তারপর প্রকৃতপক্ষে জানা যাবে যে, কোন সময় তার মনের অবস্থা কি হতে পারে। তারপর এম.টি.এ.-এর সামনে আনতে পারেন। বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম তাকে দেখাতে পারেন। বিভিন্ন সময়ে আনতে হবে। কোন সময় কোন প্রোগ্রাম গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। এটাও ঠিক না যে, এখানকার মানুষের কাছে আমাদের কোন প্রোগ্রাম ভাল লাগবে না। স্কোন থ্রপ Scun thorp আমি গিয়েছি. সেখানে ডাঃ মুজাফ্ফর সাহেব আছেন। তিনি আমাকে বললেন, সেখানে একজন ইংরেজ তার পরিচিত আছেন. যিনি প্রায় প্রত্যেক জুমুআর খুতবা নিয়মিত শুনেন। সন্ধ্যায় যখন পুনরায় রেকর্ড দেখানো শোনানো হয় তখন তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'আমি শুক্রবারের জুমআর খুতবা শুনছি।' সে খ্রীষ্টান তবে আমাদের কথাবার্তা তার ভাল লেগেছে। সে ব্যক্তি ডাঃ মুজাফ্ফর সাহেবকে জুমুআর খুতবার কিছু কিছু কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এসব কথা খুব প্রয়োজনীয় কথা– ভাল কথা। খুতবা জুমুআর বিষয়গুলো কেবল জামাতের জন্য নয় বরং অন্যদের জন্যও উপকারী হতে পারে। আল্লাহ্তায়ালা তার অন্তর উন্মুক্ত করে দিন, আহমদীয়াত কবুল করার সৌভাগ্য হোক। যা হোক, বলছিলাম, এম. টি. এ. আজকাল তবলীগের খুব ভাল মাধ্যম যা আজ থেকে ১৮/১৯ বছর পূর্বে আপনাদের হাতে ছিল না। এটা তখনই মানুষ শুনবে, যখন আপনার সাথে তার ভাল সম্পর্ক থাকবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"কেউ যখন কথা বলে, তখন খুব চিন্তা করে বলা উচিত এবং সংক্ষেপে বলা উচিত। বেশি বেশি কথা বলে বেশি উপকার হয় না। কোন সময় তো খুব ছোট একটি কথা বা চুটকিও খুব কাজে লেগে যায়–সোজা তার কানের মধ্যে পৌঁছে যায়। তারপর আবার কখনও সুযোগ হলে তখন আবার বলা যাবে।"

এবার ঐ ইংরেজের কথা বলছি যে খুতবা শুনে। সে একবার ডাক্তার সাহেবের কাছে খুতবার প্রশংসা করছিল। তার কাছে লেনদেন সম্পর্কে ইসলামী তা'লীম যা ঐ খুতবায় আলোকিত হয়েছিল, খুব ভাল লেগেছিল। তার মতে বর্তমান যুগে এ শিক্ষার খুবই প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ কথাই বলেছেন, একদিন কোন একটি চুটকি তার খুব মনোযোগ আকর্ষণ করে তার কান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর আবার সুযোগ আসলে আর একটি কথা। এভাবে আস্তে

আস্তে সত্যের পয়গাম পৌছাতে থাক এবং ক্লান্ত হয়ে পয়গাম পৌছানো বন্ধ যেন না হয়। কারণ আজকাল আল্লাহ্‌র ভালবাসা, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কে কথা শুনলে মানুষ এটাকে উন্মাদনা বলে। এরা যদি সাহাবায়ে কেরামের যুগে হতো তাহলে তাঁদেরকে এরা পাগল বলত এরা এবং তাঁরা এদেরকে কাফের বলতেন। রাতদিন অশালীন কথাবার্তা, নানা রকমের অবাধ্যতা এবং সব সময় পার্থিব জীবনের চিন্তা করাতে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তাই কথা অনেক দেরীতে প্রভাব বিস্তার করে।" হযরত (আঃ) নিজের একটি উদাহরণ দিয়েছেন-"এক ব্যক্তি সম্ভবত আলীগড় অঞ্চলে তহসীলদার ছিলে। আপনারা সবাই জানেন তহসীলদার কে হন? আমি তাকে উপদেশ বাণী শুনিয়েছিলাম। আমার কথা শুনে সে আমাকে ঠাট্টা তামাশা করতে থাকল। আমি মনে মনে বললাম 'আমিও তোমাকে ছাড়ছি না। তারপর কথাবার্তা চলতে থাকল। অবশেষে এক সময় সে ঠাট্টা তো দূরের কথা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। অনেক সময় ভাল মানুষকেও মন্দ মনে হয়।" অর্থাৎ অনেকে সৎ প্রকৃতির হয় কিন্তু মনে হয় কঠিন প্রকৃতির।

"স্মরণ রেখ প্রত্যেক তালার চাবি আছে। আর সেটা সঠিকভাবে কথা বলতে পারা। যেমন ঔষধ, কোন ঔষধ কারো জন্য উপকারী, অন্যজনের জন্য অন্য কোন ঔষধ উপকারী।"

হযরত (আঃ) এর উদ্ধৃতি এ জন্য এখানে উল্লেখ করেছি যে, এর পূর্বেও ঔষধের কথা উল্লেখ থাকবে হয়ত। তারপর হুযূর (আঃ) বলেছেন, "এমনই সব কথা ভিন্নভাবে বললে একজনের জন্য উপকার হয়। এমন না যে, সকলের জন্য একইভাবে বলতে হবে। বর্ণনাকারীর কাজ হলো যেন কারো মন্দ কথা শুনে খারাপ মনে না করে। বরং কর্তব্য পালন করতে থাকে। ক্লান্ত হয়ে না যায়। ধনবানদের মেজাজ খুব নাজুক হয়- ধর্মের ব্যাপারে অমনোযোগীও হয়, বেশি কথা শুনতেই পারে না। কোন সুযোগমত তাদেরকে নম্রতার সাথে পুণ্যের কথা বলা উচিত।" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

পৃথিবীতে তিন প্রকার মানুষ আছে। সাধারণ মানুষ, মধ্য শ্রেণী, বড় ধনবান বা ক্ষমতাশালী, উচ্চ শ্রেণী। সাধারণ মানুষ সাধারণত অল্প বোঝে। মোটা বুদ্ধি। অল্প জ্ঞান। এদের কোন কথা বুঝানো খুবই কঠিন হয়।" যারা একেবারে অশিক্ষিত হয়, আল্লাহ্‌র ফযলে এখানে আপনারা এ সমস্যার সম্মুখীন হন না। কিন্তু আমাদের দেশে এমন মানুষ অনেক আছে। "ধনবান বা ক্ষমতাশালীদেরও বোঝানো খুব কঠিন হয়। তারা নাজুক মেজাজের (স্পর্শকাতর) হয়। তারা খুব তাড়াতাড়ি অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। অহংকার, গর্ব তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং যারা তাদের সাথে কথা বলবে তারা যেন তাদের মত করে কথা বলে। অর্থাৎ খুব অল্প কথা, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে হবে। সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হলে, তবলীগ করতে হলে বক্তৃতা খুব পরিষ্কার সরল সহজ ভাষায় করতে হবে। মধ্যম শ্রেণীর মানুষ তবলীগের জন্য ভাল। তারা কথা বুঝতে পারে-তাদের মধ্যে অহংকারও থাকে না। যেমন উচ্চ শ্রেণীর মাঝে দেখা যায়। এদের বোঝা সহজ নয়।" (মলফূযাত; ২য় খন্ড; ১৬১ পৃষ্ঠা)।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) হযরত কাযী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে (রাঃ) যখন লন্ডন পাঠিয়েছিলেন, তখন হুযূর (রাঃ) তাঁকে একথাই বলেছিলেন যে, "গ্রামের লোকেরা খুব দৃঢ়ভাবে সত্যকে গ্রহণ করে। সুতরাং লন্ডন শহর থেকে দূরে কোন একটি গ্রামে গিয়ে অবস্থান করবেন। দোয়ারত থাকবেন- তবলীগ করবেন। দেখবেন দাওয়াত কতদ্রুত কার্যকর হবে। তবে স্মরণ রাখবেন ওরা কঠোরতাও প্রদর্শন করবে। আবার বুঝবেও। অতএব, কঠোরতা দেখালে অধৈর্য্য হবেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"যতটা শক্তি দিয়ে মিথ্যা সত্যের বিরোধিতা করে সত্য ততটাই শক্তিশালী ও বলবান হয়।" অর্থাৎ মিথ্যা যতই বেশি সত্যের বিরুদ্ধে কঠোর হবে সত্য ততবেশি শক্তি লাভ করবে। কৃষকদের মধ্যে এ কথা প্রচলিত আছে ঃ জৈষ্ঠ্য মাসের রোদ যতবেশি উত্তপ্ত হবে শ্রাবণ মাসে ততবেশি বৃষ্টি হবে। অর্থাৎ যত প্রচন্ড গরম পড়বে তত বেশি বৃষ্টি হবে। এটা প্রকৃতির দৃশ্য। সত্যেকে যতবেশি প্রতিরোধ করা হবে সত্য ততবেশি উজ্জ্বল হবে, চক চক করবে ঝলসে উঠবে। আমরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখেছি। যে সকল স্থানে আমাদের বিরুদ্ধে বেশি চিৎকার ও গন্ডগোল করা হয়েছে- সেখানে জামাত কায়েম হয়ে গেছে। এবং যে সব স্থানে আমাদের খবর শুনে মানুষ চুপ করে থেকেছে সেখানে বেশি প্রসার ঘটেছে।" (মলফূযাত; ৫ম খন্ড, ৩১০-১১ পৃষ্ঠা)।

আপনারা যারা বের হতে পারেন বের হবেন, দোয়া করতে থাকেন, যে সব ছোট ছোট গ্রামের মত জায়গা আছে সেখানে যোগাযোগ (রাবেতা) করতে থাকবেন। এমন স্থানের মানুষ সহজ সরল হবে। এখানেও ছোট টাউনের মানুষের মধ্যে সরলতা আছে। তারপর ইনশাল্লাহ্ এমন সুযোগ হবে যে, বাহির থেকে, ছোট টাউন থেকে আমাদের আহমদী বয়াতের পয়গাম বড় শহরের দিকে আসতে শুরু করবে। কারণ স্থানীয় লোকেরাই তখন শহরে এর প্রচার চালাবে। আমি বিভিন্ন দেশে দেখেছি, যেখানে ছোট ছোট স্থানে জামাত গতিশীল হয়েছে সে সব স্থানে বড় শহরের তুলনায় বেশি রাবেতার কাজ হয়েছে। সে সব ছোট স্থানীয় লোকদের মধ্যে যারা বড় বড় তাদের সাথেও রাবেতা করবেন। সাধারণ মানুষের সাথেও করবেন। আমি যে রকম বলেছি, আসলে আমাদের চেষ্টা তদ্বীরে, রাবেতার দিক থেকে, দোয়ার মাঝেও শিথিলতা রয়ে গেছে। কার্যতৎপরতা ও দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) হযরত কাযী আব্দুল্লাহ্ সাহেবকেও এ উপদেশই দিয়েছিলেন যে, অনেক বেশি দোয়া করতে হবে। কেবল বেশি চেষ্টা যথেষ্ট হবে না। আরো একটি কথার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, কুরআন শরীফ ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর কিতাব খুব বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। এভাবে জ্ঞান বৃদ্ধি হবে। তারপর নিজের চিন্তা-ভাবনাকে উঁচু করতে বলেছিলেন। মনে রাখবেন যে, আপনি ইউরোপ জয় করবেন। অনেকে বলেন যে, এরা তো মানবে না। কিন্তু এদের মধ্যে ভাগ্যবান পবিত্র আত্মার মানুষ সৃষ্টি হবে। ইন্‌শাল্লাহ্ হবে; হচ্ছেও। আমিও বলছি আপনারা মনোবল দৃঢ় ও উচ্চ আশা পোষণ করুন যেমন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছিলেন। ধীর স্থির ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে কাজ করতে থাকুন-কেবল পার্থিব বা জাগতিক আয় উপার্জনের চেষ্টায় সব সময় ব্যয় করবেন না। আহমদীয়াতের পয়গাম পৌছাবার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করুন। আপনারা যেখানে আহমদীয়াতের নাম ব্যবহার করে 'অ্যাসাইলম' নিয়েছেন সেখানে আহমদীয়াতের খেদমতের দায়িত্বও পালন করুন। এখানকার রঙ্গীন জীবনে হারিয়ে যাবেন না। আল্লাহ্‌তায়ালার সামনে মাথা নত করে দোয়া করতে করতে চেষ্টা করতে থাকেন আল্লাহ্ অবশ্যই বরকত দিবেন। আল্লাহ্ করুন আপনারা যেন গভীর মনোযোগের সাথে এ ব্যাপারে চেষ্টা করেন।

কিন্তু একথাও স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেখানে বলেছেন, তোমরা দাওয়াত ইলাল্লাহ্ কর-সেখানে আহ্বানকারীদের সৎকর্মশীল হতেও বলেছেন। তারা আনুগত্যকারী ও আহ্বানকারী হবেন যারা নিজেদের সৎকর্মশীল বানাবেন। এমন না হয় যেন অন্যদেরকে

দাওয়াত দিচ্ছেন অথচ স্বয়ং নামাযও নিয়মিত পড়েন না, অন্যদের পাওনা তাদেরকে আদায় করছেন না; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করেন না। যারা নিজেরা ইসলামী শিক্ষাগুলোকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে তাদের দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজও বরকতপূর্ণ হয়। এখানকার মানুষ বড় সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন, তারা আপনার সামান্য ত্রুটিও ধরে ফেলবে এবং আপনাকে বলবে। এটা অন্যান্য স্থানেও হয়। আইন মেনে চলা কর্তব্য। উত্তম চরিত্রের বিকাশ ঘটা উচিত। এর সাথে ইবাদতের উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কারণ এটা ইসলামের শিক্ষা যে, তবলীগ কর, আল্লাহ্‌র নির্দেশের কথা বল তার উপর তুমি নিজেও আমল কর। তবেই কল্যাণমন্ডিত হবে। নতুবা তুমি যা করছ না তা অন্যদের করতে বলছ। এবং এভাবে নিজেরা পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছ। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা এমন কথা কেন বল যার উপর নিজেরা আমল কর না?" [সূরা সাফ ঃ ৩-৪]

অতএব, দাঈআনে ইলাল্লাহদের জন্য নিজেদের উত্তম নমুনা সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেককে স্মরণ রাখতে হবে যে, সে দাওয়াত ইলাল্লাহ করুক বা না করুক, সে যদি আহমদী বলে পরিচিত হয়ে থাকে, তার উপর সকলের নজর থাকবে। তার যে কোন ভুল কাজ, যে কোন ত্রুটিযুক্ত কার্যকলাপ আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে মন্দ প্রভাব ফেলবে। যে কোন আহমদীর ভুল কাজ অন্য একজন ভাল দাঈ ইলাল্লাহর দাওয়াতের প্রভাবকে নষ্ট করতে পারে। অতএব, যে নিজে দাওয়াত করে না সে যেন কমপক্ষে নিজেকে সঠিকভাবে রাখে যেন অন্য দাঈয়ানদের জন্য সুবিধা সৃষ্টি করে। কেউ যেন কখনও আঙ্গুলী নির্দেশ করে এ কথা না বলে যে, "প্রথমে নিজেদের তো ঠিক কর। নিজেদের লোকদের সংশোধন কর।" অতএব,

প্রত্যেক আহমদী নিজের সংশোধন করুন, ধারাবাহিকভাবে এদিকে নজর দিয়ে যেতে হবে। যদি আপনারা নিজেদের সম্পর্ক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সাথে রাখতে চান তাহলে নিজেদের সংশোধন করতে হবে। এ জামাতের কোন ব্যক্তি যেন ইসলামের বাণী প্রচারে বাধা সৃষ্টি না করে।

মোটকথা, দাওয়াত ইলাল্লাহর জন্য আমলে সালেহ সৎকর্মশীল হওয়া খুবই জরুরী। যখন নিজের আমল নেক হবে, তখন আপনি অন্যদেরকে বলার যোগ্যতা লাভ করবেন। নতুবা আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা বল একটা কর আরেকটা এবং এভাবে তোমরা পাপাচারে লিপ্ত হতে পার। পুণ্যলাভের বদলে পাপের অংশীদার হবে।

হযরত মসীহ্ (আঃ) বলেছেন ঃ "ইসলামকে রক্ষা করা এবং এর সত্যতা প্রকাশের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন এই যে, তোমরা খাঁটি মুসলমান হয়ে আদর্শ মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও। দ্বিতীয় কথা এই যে, এর গুণাবলী এর উত্তম শিক্ষাগুলোকে পৃথিবীর সামনে প্রচার ও প্রকাশ কর।" [মলফূযাত; ৪র্থ খন্ড; ৬১৫ পৃঃ]।

হযরত (আঃ) এখানে দু'টি কথা বলেছেন, এবং উক্ত কুরআনী আয়াতের কথাই বলেছেন। প্রথমে নিজের নমুনা সঠিক কর, নিজের চাল-চলন, নিজের আচরণ ঠিক কর, নিজের কার্যক্রমের সংশোধন কর, তারপর দাওয়াত ইলাল্লাহ কর। আল্লাহ্ তোমার কাজে মঙ্গল রাখবে, ইনশাল্লাহ। তারপর হযরত (আঃ) আরো বলেছেন,

"আঁ-হযরত (সঃ) এর মৃত্যুর পর মদিনার অবস্থা কি হয়েছিল? প্রত্যেক অবস্থারই পরিবর্তন হয়। সুতরাং পরিবর্তনের কথা স্মরণ রাখ এবং নিজের শেষ সময়কে স্মরণ রাখ। পরবর্তীতে যারা আসবে তারা তোমাদের মুখের দিকে নজর করবে। তোমরা কি নমুনা সৃষ্টি করেছ তা তারা দেখবে। তোমরা যদি নিজেদেরকে পুরোপুরিভাবে ইসলামী শিক্ষার উপর আমলকারী না বানাও তাহলে তোমরা নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে ধ্বংস করছ (বলে ধরে নেয়া হবে)।"

দাওয়াত ইলাল্লাহ্ করা তো আমাদেরই কাজ। যদি নিজের নমুনা নেক নমুনা না হয় তাহলে নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরকে নষ্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছ। কারণ তারা তোমাদের নমুনা দেখবে। মানুষের স্বভাব তো এটাই যে, তারা নমুনাকেই দেখে ও নকল করে খুব দ্রুত প্রভাবিত হয়। একজন মদ্যপায়ী যদি বলে, মদ পান করো না, একজন ব্যাভিচারী যদি বলে ব্যাভিচার করো না, চোর যদি অন্যকে বলে, চুরি করো না, তাহলে তাদের কথায় কার কি উপকার হবে? বরং অন্যরা বলবে, বড় নির্লজ্জ! নিজে যা করে অন্যকে তা করতে নিষেধ করে। যারা নিজেরা কোন পাপে আসক্ত হয়ে অন্যকে উপদেশ দেয় তারা অন্যদেরকেও বিপথগামী করে। যারা অন্যদেরকে উপদেশ দেয় অথচ নিজেরা আমল করে না, তারা বেঈমান হয়ে থাকে এবং নিজেদের বাস্তবতাকে ঢেকে থাকে। এমন ওয়ায়েযীনদের (উপদেশ দাতা) দ্বারা পৃথিবীর মানুষের অনেক বড় ক্ষতি সাধন হয়।" (মলফূযাত; ৩য় খন্ড, ৫১৮ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে মনোযোগ দেই। সৎকর্মশীলও হই। তবেই বলতে পারব, 'আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এবং তখনই আমাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে এই বলে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন। এবং আমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী বান্দা হয়েছি। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করেছি। তারপর যদি আমাদের এ ধরনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কায়েম থাকে, আমলও কায়েম থাকে, সাথে সাথে চলতে থাকে, তবেই আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে গণ্য হতে পারব।

সুতরাং আমি যে রকম বলেছি, অতীতের ভুলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আমরা যেন ক্ষমা প্রার্থী হই। মাগফেরাত (ক্ষমা) চাই তারপর আগামীতে পূর্ণ উদ্যমের সাথে, নতুন আবেগ ও উত্তেজনা নিয়ে আন্তরিকতার সাথে যেন আহমদীয়াতের প্রচারের ও প্রসারের জন্য অগ্রসর হই। পৃথিবীর, এমনকি স্কটল্যান্ডের বহু অংশে আহমদীয়াতের পয়গাম পৌছেনি; কেউ আহমদীয়াতের খবর জানেই না। সুতরাং অনেক প্রকারের চেষ্টা করা প্রয়োজন। দোয়ার প্রয়োজনও অনেক বেশি। তবেই আমরা সত্যিকার অর্থে দাবী করতে পারব যে, 'আমরা পৃথিবীর সকল মানুষকে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর পতাকা তলে নিয়ে আসব ইনশাল্লাহ্। এজন্যই আমরা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর হাতে বয়াত করেছি। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের তৌফিক দান করুন। এসব কিছু পাওয়ার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে ব্যবস্থা পত্র প্রদান করেছেন-তা নিম্নরূপ হুযূর (আঃ) বলেছেন,

"আমাদের বিজয় লাভের অস্ত্র এস্তেগফার, তওবা, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা; খোদাতায়ালার মহিমাকে সামনে রাখা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথারীতি আদায় করা। নামায দোয়া কবুলের চাবি। যখন নামায পড় তখন দোয়া কর- অবহেলা করোনা, সকল প্রকার পাপ, তা হুকুকুল্লাহ্ সংক্রান্ত হোক, অথবা হুকুকুলএবাদ সংক্রান্ত হোক (আল্লাহ্‌র ইবাদত সংক্রান্ত অথবা বান্দার প্রতি কর্তব্য পালন সংক্রান্ত হোক), তা থেকে নিজেকে বাঁচাও।'

মলফূযাত; ৫ম খন্ড; ৩০২ পৃষ্ঠা)। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে তৌফিক দিন।

[আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ২২ অক্টোবর, ২০০৪ইং]

অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

তাকওয়ার গুরুত্ব

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ,খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ৬ মার্চ, ২০০৪ইং তারিখ ওয়ানাড়ুগু, বুরকিনা ফাঁসূ (পশ্চিম আফ্রিকা)-তে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আকদস (আইঃ) সূরা আল্ হুজুরাতের ১৪নং আয়াত তেলাওয়াত করেন। এর বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٤﴾

"হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে নর ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে মুত্তাকী, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিদিত।"

আল্লাহ্‌তায়ালা 'তাকওয়া' (খোদাভীরু) শব্দটি কুরআন করীমে এতবার ব্যবহার করেছেন যেন এর কোন শেষ নেই। আর সম্ভবত আর কোন শব্দ এত ব্যবহার হয়নি। বিভিন্ন কৌশলে ও বিভিন্ন আকারে এ প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বরং একজন মুসলমান যখন বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন বিয়ের খুতবায় ৫ বার তাকওয়ার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাকওয়ার গুরুত্ব এ কথা থেকে অনুমান করুন। বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে নর ও নারী একটি একটি নতুন জীবনের সূচনা করে থাকে। কেবল নর ও নারীই একটি চুক্তি করেন; বরং দু'টি পরিবার আপোষে একটি সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তাকওয়া না থাকলে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এক মুসলমান নর ও নারীর একটি সম্পর্ক বন্ধনের ফলে নতুন এক সত্তার আগমন হয়ে থাকে। এক মুসলমান স্বামী -স্ত্রী যদি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের তাকওয়াশীল হওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই সংক্ষিপ্ত কথা এই ঃ তাকওয়া এমন একটি মৌলিক বিষয় যা ছাড়া খোদাতায়ালার সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করার চিন্তাও ভুল। আজ এ প্রসঙ্গেই কয়েকটি কথা বলবো।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি এতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন ঃ হে লোক সকল! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে নর ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি তিনি, যিনি সবচেয়ে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ চিরস্থায়ী জ্ঞানের অধিকারী আর সবসময় খবর রাখেন।

অতএব আল্লাহ্‌তায়ালা বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছেন, তোমাদের ছোট গোত্র ও বড় গোত্রের যে বিভক্তি এটা কেবল তোমাদেরকে চিনতে পারার জন্যে।

এখন দেখে নিন, আপনাদের দেশ আফ্রিকার মত ছোট ছোট এলাকার চীফ রয়েছেন আবার কয়েকজন কোন বড় চীফের অধীনে। পুনরায় এসব মিলে দেশীয় পর্যায়ে রয়েছে একটি জাতি। এভাবে গোটা পৃথিবীও বিভক্ত। অতএব আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন,

> *এই যে বিভক্তি একে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন বলে মনে করো না। তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বড় গোত্র হওয়া বা অধিক ধনী দেশ হওয়ার মাঝে নয়। বরং আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তিই, সেই গোত্রই অথবা সেই জাতিই যা তাকওয়ার ক্ষেত্রে সবার অগ্রে।*

আর স্মরণ রাখুন, তাকওয়ার মান নিজেদের পুণ্য প্রকাশের মাধ্যমে নিরূপিত হয় না। বরং আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তাই আমাদের প্রত্যেক চাল-চলন ও কর্মকান্ড সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি অবগত আর এ প্রসঙ্গে জ্ঞানও রাখেন। কোন কর্ম দেখাবার উদ্দেশ্যে আর কোন কর্ম আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ আকর্ষণ করার জন্যে করা হয়েছে তা আল্লাহ্‌তায়ালা ভালই জানেন।

তাকওয়ার সংক্ষিপ্ত অর্থ বলছি। **তাকওয়ার অর্থ নিজ আত্মা ও সত্তাকে বিপদ আপদ থেকে সুরক্ষা করা আর শরীয়তি পরিভাষা অনুযায়ী তাকওয়া অর্থ মানুষকে পরীক্ষা করে আত্মাকে এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে রক্ষা করা। আর এটা তখনই হয়ে থাকে যখন নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকা যায়।** বরং এর জন্যে কখনও কখনও বৈধ বস্তুকে পরিত্যাগ করতে হয়। যেমন, রমযানে পবিত্র ও বৈধ বস্তু থেকেও মু'মিন আল্লাহ্‌র আদেশের কারণে বিরত থাকে। অতএব যদিও আসল তাকওয়া এই, পাপের দিকে নিয়ে যায় এমন সব বস্তু থেকে নিজেকে নিজে রক্ষা করা। আর এটা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্যে ফরয ও অবশ্য কর্তব্য। সে যে কোন জাতির হোক না কেন। আল্লাহ্‌তায়ালা এটা জিজ্ঞেস করছেন

না, তুমি অমুক জাতির লোক যেটা আমার জাতি, তোমাকে এজন্যে কিছুটা ছাড় দেয়া হচ্ছে। অথবা তুমি তমুক জাতির লোক। এটা উন্নতশীল নয় বিধায় ছাড় দেয়া হচ্ছে। না, বরং আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, তোমাদের এ বাহানা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব প্রত্যেককে নিজে নিজে প্রত্যেক অনিষ্ঠ থেকে সুরক্ষার জন্যে চেষ্টা করা উচিত। আর সব রকমের পুণ্য কর্ম করার জন্যে সব রকম যোগ্যতার ব্যবহার করা উচিত। তখনই আমরা বলতে পারি, আমরা যুগ-ইমামের জামাতের অন্তর্ভূক্ত। স্মরণ রাখুন! সব রকম খারাপ কাজ থেকে তখনই রক্ষা পাওয়া যেতে পারে যখন প্রাণে খোদার ভয় থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালার এমন ভয় থাকে যাতে তাঁর প্রতি ভালবাসারও প্রকাশ ঘটে। আর এটা তখন লাভ হয় তখন তাঁর সামনে ঝুঁকা হয়, তাঁর কাছে চাওয়া হয়, এ দোয়া করা হয়, হে খোদা! আমি তোমার ভালবাসায় সেসব বিষয় পরিত্যাগ করতে চাচ্ছি যেগুলো পরিত্যাগ করার আদেশ তুমি দিয়েছ। আর সেসব পন্থা অবলম্বন করতে চাচ্ছি যা করার জন্যে তুমি আদেশ দিয়েছ? কিন্তু তোমার নৈকট্য লাভের জন্যে তোমার অনুগ্রহ থাকা আবশ্যক। হে আল্লাহ্! নিজ অনুগ্রহে আমাকে তাকওয়া দান কর।

নামাযে কেঁদে কেঁদে নিজের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করা হলে নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি অবশ্যই আমাদের দোয়া কবুল করবেন। অতএব সবার আগে আমাদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালার সমীপে অবনত হয়ে নিজেদের নামাযকে, নিজেদের দোয়াকে তাঁর উদ্দেশ্যে নিষ্ঠাপূর্ণ একান্ত করতে হবে আর এটাই মৌলিক বিষয়। নামাযে যদি উৎসাহ উদ্দীপনা ও আবেগ সৃষ্টি হয় তাহলে মনে করুন সব কিছু পাওয়া গেল। নামাযে বিশেষভাবে এ দোয়া করুন, যা আমাদেরকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ দোয়া করতেন ঃ **আল্লাহুম্মা আতি নাফসী তাক্বওয়াহা ওয়া যাক্কিহা ওয়া আনতা খায়রু মান যাক্কাহা** অর্থাৎ আল্লাহ্! আমার আত্মাকে এ তাকওয়া দান কর আর একে অনেক পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দাও আর তুমিই উত্তমভাবে সব পবিত্র করতে পার (অন্তরও আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হতে পারে)। (সহী মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র ওয়াদ্দোয়া) আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সবাইকে নিজের অন্তর পবিত্র করার সৌভাগ্য দান করুন।

অন্তরকে আল্লাহ্‌তায়ালার জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করার জন্যে কোন কোন বিষয় আল্লাহ্‌তায়ালা নিষেধ করেছেন আর কোন কোন কাজ খোদাতায়ালা করার আদেশ দিয়েছেন তা দেখার জন্যে আমাদেরকে কুরআন শরীফ শেখা ও পাঠ করা উচিত। যারা কুরআন করীমের অনুবাদ জানেন তারা অন্যদেরকে শিখান। প্রত্যেক দিন স্বল্প সময়ের জন্যে হলেও জামাতে কুরআন করীমের দরসের ব্যবস্থা করুন যারা নিজেরা কুরআন করীম পড়তে ও বুঝতে পারে না– যেন তাদের কাছেও এ সুন্দর শিক্ষা ব্যাখ্যার সাথে পৌছে যায়।

প্রত্যেক দিন প্রত্যেক আহমদীকে অবশ্যই কুরআন করীমের তেলাওয়াত করা উচিত যেন কুরআন করীমের কল্যাণরাশি অবতীর্ণ হয় আর অন্তর তাকওয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে যেতে থাকে, বরং হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম তো এ-ও বলেছেন, কোন ব্যক্তি মুমিন না হলেও মূর্খতা, হিংসা ও কৃপণতার মাধ্যমে কাজ না করে যদি কেবল ন্যায় বিচারের মাধ্যমে কাজ করে কুরআন করীম দেখে, এটা হলো তাকওয়ার প্রাথমিক অবস্থা, কোন ব্যক্তি যদি কুরআন শরীফ পড়ে তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে হেদায়াতের আলো দিয়ে দেন। অতএব যে ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার দৃষ্টিতে কুরআন করীম পাঠ করে– কুরআন করীম হেদায়াত দেয় না ও তাকওয়ার পথে চালনা করে না, এটা তার জন্যে কি করে হতে পারে? একজন ঈমান আনয়নকারীর প্রাণে কুরআন করীম পাঠ করে ও শুনে হেদায়াতের জোতি যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে তার চেষ্টা করে দেখা উচিত কোথাও না আবার তাকওয়ার কোন কমতি রয়ে গিয়েছে। আমাদের অহংকার ও আমাদের আত্মম্ভরিতা আমাদেরকে কি আসল শিক্ষা থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে ও আমাদের মাঝে তাকওয়া আছে কি নেই সেটা আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত। কেননা কুরআন করীম তো এটা বলে দিয়েছে, এতে মুত্তাকীদের জন্যে পথ নির্দেশনা রয়েছে। আমরা কুরআন করীমের আদেশগুলোর উপর যদি আমল না করি তাহলে সেটা আমাদের ত্রুটি আর আমাদের জন্যে চিন্তার বিষয়ও বটে। আল্লাহ্‌তায়ালা তো আমাদেরকে প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। তবে শর্ত এই, আমরা যেন তাঁর শিক্ষানুযায়ী হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং পুণ্য কাজ করি যেভাবে তিনি বলেছেন, **ওয়ামা ইয়াফআলু মিন খায়রিন ফালাঁইয়ুক ফারূহু ওয়াল্লাহু আলীমুম বিল মুত্তাকীন** (সূরা আলে ইমরান; ১১৬)। অর্থাৎ, আর তারা যে কোন ভাল কাজই করুক তাদেরকে এর প্রতিদানে কখনও অস্বীকার করা হবে না, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ মুত্তাকীগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে তাকওয়ার ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে ও ভাল ভাল কাজ করার সৌভাগ্য দান করুন। আর আমরা প্রত্যেক সেই পুরস্কার থেকে অংশগ্রহণকারী হই যা তাঁর দৃষ্টিতে আমাদের জন্যে উত্তম।

হযরত আবূ যর বর্ণনা করেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং মন্দ কাজ করার পর ভাল কাজ কর কেননা, ভাল কাজ মন্দ কাজের প্রভাবকে মিটিয়ে দিয়ে থাকে (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদুল আনসার হাদিস আবিযর আল্ গাফ্‌ফারী)।

এর অর্থ অবশ্যই এই নয়, জেনে বুঝে মন্দ কাজ কর আর এর পরে ছোট একটি ভাল কাজ কর আর মনে কর যে, পাপ মিটে

গেছে। বরং এর অর্থ এই, ভুলে অনিচ্ছায় কোন মন্দ কাজ সংগঠিত হয়ে গেলে এর অনুভূতি আসে- লজ্জা লাগে, আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হয়, তখন ইস্তিগফার কর এবং মন্দ কাজ না করার প্রতিজ্ঞা করে নাও; তখন এর প্রভাব মিটে যাবে এজন্যেই পরে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর অর্থাৎ মন্দ কাজ থেকে রক্ষা পেতে চেষ্টা করতে থাক তখন আল্লাহ্‌তায়ালা ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে এমন কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয় যা অধিক হারে লোকদেরকে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাওয়ার কারণ হবে। তখন তিনি (সঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র তাকওয়া ও উত্তম আচরণ। এদেশের লোক খুবই উত্তম আচরণের অধিকারী এটা খুবই ভাল কথা। আহমদী হওয়ার পর যদি এ উত্তম আচরণের সাথে আপনাদের মাঝে তাকওয়াও সৃষ্টি হয়ে যায়; আর তারই আদেশ নিষেধের ওপর আমল করা আপনাদের নিজেদের জীবনের অংশ বানিয়ে নেন তাহলে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন।

পরের কথা এই, তাকওয়া অনুযায়ী জীবনকে সাজানো আর তা কেবল সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা যথেষ্ট নয় বরং নিজের ভাবী প্রজন্মের মাঝেও এ গুণ সৃষ্টি করা আবশ্যক। কেননা, আমরা যদি নিজেদের ভাবী প্রজন্মকে আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী চালানোর চেষ্টা না করে থাকি সেক্ষেত্রে আমাদের তাকওয়া আমাদের সত্তার মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। আর আমাদের মরণের পর আমাদের ভাবী প্রজন্মের মাঝে এটা অব্যাহত থাকতে পারে না। আমরা যদি নিজেদের ভাবী প্রজন্মকে সঠিক পন্থায় তরবিয়ত করে না থাকি আর তাদেরকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে না থাকি তাহলে আমাদের ভাবী প্রজন্ম বিগড়ে গিয়ে অতীত লোকদের মত হয়ে যাবে। তাদের মাঝে কোন ধর্ম থাকবে না। এজন্যে পথ প্রদর্শনের যে জ্যোতি লাভ হয়েছে তা তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে অব্যাহত রাখা প্রত্যেক আহমদীর জন্যে আবশ্যক। এটা এ জন্যে যেন প্রত্যেক ভাবী প্রজন্ম আগের চেয়ে অগ্রসরমান হয়ে তাকওয়ার ওপর পদচারণাকারী হয়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানের ইচ্ছা কেবল এ উদ্দেশ্য না হবে যে, সে ধার্মিক ও মুত্তাকী হয় আর খোদাতায়ালার আনুগত্যকারী হয়ে তাঁর ধর্মের সেবক হয় তাহলে তা হবে সর্বৈব অযথা বরং এক প্রকার পাপ ও গুনাহ। আর স্থায়ী নিষ্ঠার পরিবর্তে এর নাম স্থায়ী মন্দ রাখা বিধেয় হবে [অর্থাৎ পুণ্যবান প্রজন্ম নয় মন্দ প্রজন্ম] কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এ কথা বলে, আমি নিষ্ঠাবান ও খোদা-ভীরু আর ধর্মের সেবক সন্তানের-আকাঙ্ক্ষা করি তখন তার একথা বলাও একটি নিরস দাবীই হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বয়ং অবস্থা সংশোধন না করে। সে যদি স্বয়ং দুষ্কর্ম ও অপরাধীর জীবন কাটায় আর মুখে নেক ও মুত্তাকী সন্তানের আকাঙ্ক্ষার কথা বলে তাহলে সে তার এ দাবীতে মিথ্যাবাদী।

নেক ও মুত্তাকী সন্তানের আকাঙ্ক্ষার আগে স্বয়ং তার সংশোধন করা ও নিজের জীবনকে মুত্তাকীর জীবন বানানো আবশ্যক তখন তার এ আকাঙ্ক্ষা হবে ফলপ্রসূ আকাঙ্ক্ষা। আর এ সন্তান প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী পুণ্যবান আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য হবে।"

আবার হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বিশেষভাবে আহমদীদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন ঃ "বয়াতের একান্ত উদ্দেশ্য খোদাভীতি ও তাকওয়ার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। একে পার্থিব উদ্দেশ্যের সাথে কখনও মিশিয়ে ফেলো না। রীতিমত নামায এবং তওবা ও ইস্তিগফারে নিয়োজিত থাক, মানবমন্ডলীর অধিকার সংরক্ষণ কর আর কাউকে দুঃখ দিও না। সরলতায় ও পবিত্রতায় উৎকর্ষ সাধন কর তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালা সব রকমের অনুগ্রহ দান করবেন।

মহিলাদেরকে নিজেদের ঘরে নসীহত কর যেন তারাও রীতিমত নামায আদায় করে। আর তাদেরকে অভিযোগ ও পরচর্চা করা থেকে বাধা দাও।

তাদেরকে পবিত্রতা ও সরলতা অবলম্বনের শিক্ষা দাও (এটা সুস্পষ্ট, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেরা এর উপর আমল না করবে ততক্ষণ তাদেরকে শিখাতে পারবে না) আমাদের পক্ষ থেকে বুঝানোই কেবল শর্ত। এর উপরে কার্যকরভাবে আমল করা তোমাদের কাজ" (মলফূযাত, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৬)।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে সঠিক অর্থে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত করুন। আমরাও ভাবী প্রজন্মকে এভাবে তরবিয়ত করি যেন, তারাও তাকওয়ার উচ্চ মানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর কখনও আমরা বা আমাদের ভাবী প্রজন্ম আল্লাহতায়ালার আদেশ নিষেধ পালন থেকে যেন দূরে সরে না যায় আমরা সবাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সব নসীহতের ওপর আমলকারী হই। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ঝুঁকে থাকি। তাঁর অনুগ্রহের প্রত্যাশী হই। যে উদ্দেশ্যে আমরা এ জলসায় একত্র হয়েছি সে উদ্দেশ্য লাভকারী হই। সফরে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে যেন বিশেষভাবে দোয়ায় মশগুল থাকার সৌভাগ্য দান করেন এবং আধ্যাত্মিকতা ও তাকওয়ায় উন্নতি দান করেন আর যখন আমরা নিজেদের ঘরে পৌঁছি তখন আমরা নিজেদের মাঝে এক পরিবর্তন অনুভব করতে থাকি যেন আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিয়ে আসা শরীয়তকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করে দিই। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে এ সৌভাগ্য দিন।

(১৬-২২ তারিখের আল ফযল ইন্টারন্যাশনালের সৌজন্যে)

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত

ঐতিহাসিক মহান ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর একটি ইলহাম- "তেরি উকদাকুশাই হুশিয়ারপুর মে হোগী" অনুযায়ী কাদিয়ান হতে হুশিয়ারপুর গমন করে নির্জনে ৪০ দিন (চিল্লাকাশি) আরাধনায় থেকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট বিশেষভাবে দোয়া করেন এবং দ্বীনে ইসলামের সত্যতা ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য সর্বশক্তিমান খোদার নিকট নিদর্শন কামনা করেন। এর জবাবে আল্লাহ্তায়ালার পক্ষথেকে তাঁর নিকট সুদীর্ঘ শুভ সমাচার আসে। এর মাঝে তাঁকে ইসলাম ও আহমদীয়ত সম্বন্ধে অসাধারণ অদৃশ্যের বিপুল সূক্ষ্ম সংবাদ জানানো হয় আর এতে মুসলেহ মাওউদ তথা মহান সংস্কারক পুত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত সুসমাচার দেয়া হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সেসব ইসলামী ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৮৬ সনের ২০শে জানুয়ারি তারিখে একটি প্রচার লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এর জরুরী অংশগুলো নিম্নে দেয়া হ'ল।

মহান ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

হযরত আকদস (আঃ) বলেন ঃ

"পরম করুণাময়, পরম দাতা মহিমান্বিত খোদা যিনি সর্বশক্তিমান, যার মর্যাদা মহাগৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন ইলহাম দ্বারা সম্বোধনপূর্বক বলেন ঃ

"আমি তোমাকে এক করুণার নিদর্শন দিতেছি। তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ তদনুযায়ী আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসমূহ শুনিয়াছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে করুণাসহকারে কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানায়) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি। সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ।

নিদর্শনের উদ্দেশ্য ঃ

খোদা বলিয়াছেন, 'যাহারা জীবন প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করে। যাহাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্তায়ালার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উহার যাবতীয় আশিসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান যা ইচ্ছা করি- করিয়া থাকি এবং যেন তাহাদের প্রতীতী জন্মে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যাহারা অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কিতাব তাঁহার রসূল পাক মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করিয়া থাকে, তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।"

মুসলেহ্ মাওউদের অসাধারণ গুণাবলী ও কার্যাবলী ঃ

"সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই পুত্র তোমারই সন্তান হইবে। সুশ্রী, পবিত্র পুত্র, তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদ দাতাও বটে...।

তাহার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁক-জমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করিবে। সে কালেমাতুল্লাহ্-আল্লাহ্র বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে (ইহার অর্থ বুঝি নাই) সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয় পুত্র।

মাযহারুল হাক্কে ওয়াল উলা কায়ান্নাল্লাহা নাযালা মিনাস্ সামায়ে

অর্থাৎ, সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ্ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার আগমন অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতি আসিতেছে, জ্যোতি। খোদা তাহাকে তাঁহার সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে আপন রূহ ফুঁকিয়া দিব এবং খোদার ছায়া তাহার শিরে থাকিবে। সে শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির উপায়স্বরূপ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশিস লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হইবে। ওয়া কানা আমরাম্মাকযিয়া (অর্থাৎ ইহাই আল্লাহ্র অটল মীমাংসা)। (ইশ্তেহার ২০শে ফেব্রুয়ারী)

অতঃপর ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চ আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ-ও ঘোষণা করেন, উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহান পুত্র নয় বছরের মধ্যে অবশ্যই জন্মলাভ করবে। সুতরাং এ নির্ধারিত সময়সমীমার মধ্যেই তৃতীয় বছর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের **১২ই জানুয়ারী তারিখে শুভ সোমবার প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন**। তাঁর পবিত্র নাম ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বরের ইশতেহারে প্রকাশিত ইলহাম অনুযায়ী বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ রাখা হয়। তাঁর জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইলহাম মারফত অবগত হয়ে নির্দিষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে ইহা প্রকাশ করেন, মুসলেহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র) তিনিই। তিনি ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হন। তাঁর ৫২ বছরব্যাপী সুদীর্ঘ খেলাফতকালীন বিপুল ঘটনাবলী প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি বাক্য তাঁর মাঝে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং তিনি নিজেই আল্লাহ্তায়ালার নিকট হতে ইলহামপ্রাপ্ত হয়ে **১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুসলেহ মাওউদ হবার দাবী করেন**। হযরত মুসলেহ মাওউদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান ইসলাম প্রচার কেন্দ্রসমূহ ও বিপুল সংখ্যক উন্নতিশীল জামাত এবং তাঁর লিখিত কুরআন শরীফের তুলনাহীন অমূল্য তফসীর, (তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীর) জ্ঞান ও তত্ত্ব-পূর্ণ অসংখ্য পুস্তক খুতবা ও বক্তৃতা এবং তাঁর দ্বারা জামাত ও নেযামে খিলাফতের দৃঢ় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা জীবন্ত খোদার জীবন্ত নিদর্শনকে চির অম্লান ও সমুজ্জ্বল রয়েছে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার স্বাক্ষর হয়ে আছে ও থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর আগমনের উল্লেখ বাইবেলে রয়েছে, যাঁর জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) করেছিলেন, যাঁকে লাভ করার জন্য এ যুগের মহাপুরুষ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিরবে-নিভৃতে একাধারে চল্লিশ দিন, হুশিয়ারপুরের এক বাড়িতে দোয়া করে কাটিয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবাদ পেয়ে তাঁর জন্ম, ব্যক্তিত্ব, কর্মময় জীবন সম্পর্কে তাঁর জন্মের পূর্বেই সমগ্র জগদ্বাসীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আর জন্মের পর বাস্তবিকই যিনি এক অসাধারণ প্রতিভা, অতুলনীয় জ্ঞান, অত্যন্ত সুক্ষ্মদর্শী ও বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন। ৫১ বছর জামাতে আহমদীয়ার খেলাফতে অধিষ্ঠিত থেকে এক নিঃস্ব, দুর্বল, ছোট ও অসহায় জামাতকে এক মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। উপমহাদেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বহিঃর্বিশ্বের কোণায় কোণায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি হলেন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সন্তান, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ, হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)। তাঁর (রাঃ) স্বর্ণোজ্জ্বল ও অবিশ্বরণীয় কর্মময় জীবনের কিছু দিক তুলে ধরছি।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর কর্ম জীবন সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর সবুজ ইশতেহারে বলেছিলেন-"**তার সঙ্গে ফযলের আবির্ভাব হবে, সে পৃথিবীতে এসে তার সঞ্জীবনী শক্তি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে।**" আর আমরা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর জীবনে এই ভবিষ্যদ্বাণীরই প্রতিফলন দেখতে পাই। তাঁর কর্মময় জীবনের অন্যতম একটি দিক ছিল, জামাতে আহমদীয়াকে সাংগঠনিকভাবে সুসংগঠিত করে, তার ভিতকে মজবুত করা।

তিনি মাত্র ২৫ বছর বয়সে ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে, জাগতিক বিচারে, তিনি ছিলেন অল্প বয়স্ক যুবক। যার ছিল না কোন সাংগঠনিক জ্ঞান, দক্ষতা, ছিল না সংগঠন চালানোর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা। ছিল না কোন টাকা পয়সা। ফলে জামাতের ধ্বংসই ছিল অনিবার্য। কিন্তু এবারও এটাই প্রমাণ হলো- আল্লাহ্ যাঁকে খলীফা নির্বাচিত করেন, আল্লাহ্ই তাঁকে সাহায্য করেন। আল্লাহ্ই তাঁকে শিখান। তাঁর জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার কোন প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ্ নিজ হাতে ধরে ধরে তার দ্বারা কাজ করান। আর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তেমনি একজন খলীফা ছিলেন। যাঁর সাথে আল্লাহ্ এ রকম ব্যবহার করেছিলেন। আল্লাহ্ নিজ হাতে তাঁকে ধরে কাজ করিয়েছেন।

তিনি খলীফা হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাঁকে শিখান, উপলব্ধি করান-জামাতকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বাস্তব পরিকল্পনা ও সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা। এজন্য তিনি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার এক মাস পর সারাদেশের আহমদী প্রতিনিধিদেরকে 'পরামর্শের' জন্য কাদিয়ানে ডাকেন। পরামর্শের জন্য সদস্যদেরকে একত্রিত করা ছিল তার প্রথম সাংগঠনিক কাজ। তাদের পরামর্শ নিয়ে, চিন্তা ভাবনা ও দোয়া করে, তিনি একযোগে তবলীগ, তরবিয়ত, সংশোধনমূলক সাংগঠনিক কাজ শুরু করেন। এখানে তার কিছু তুলে ধরা হলো-

(১) হযরত মুসলেহ মাওউদ (আঃ) ১৯২২ সালে 'মজলিসে মুশাভিরাত' অর্থাৎ পরামর্শ সভা, যাকে শূরা বলা হয় চালু করেন।

(২) একই বছর অর্থাৎ ১৯২২ সালে তিনি ১৫ বৎসরের উর্ধ্ব আহমদী মহিলাদের সংগঠন 'লাজনা ইমাইল্লাহ্' প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য হলো আহমদী মহিলাদের তালীম তরবিয়তের মানকে উন্নত করা। এক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা। একই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২৮ সালে ১৫ বৎসরের নিচের মেয়েদের সংগঠন নাসেরাতুল আহমদীয়া গঠন করেন। তিনি আহমদী যুবকদের সুসংগঠিত করা ও তাদেরকে উত্তম আখলাক গঠন করে ইসলামের খাঁটি আধ্যাত্মিক সেবকদলে পরিণত করার লক্ষ্যে ১৯৩৮ সালে ১৫ থেকে ৪০ বৎসরের যুবকদের সংগঠন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া গঠন করেন। ১৯৪০ সালে ১৫ বৎসরের নিচের কিশোরদের সংগঠন 'মজলিস আতফালুল আহমদীয়া' এবং ৪০ উর্ধ্ব পুরুষদের সংগঠন 'মজলিসে আনসারুল্লাহ্' গঠন করেন।

এ অঙ্গ সংগঠন গঠনের ফলে জামাতের ভিত যেমন মজবুত হয় তেমনি কর্মধারায়ও সঞ্চারিত হয় নব উদ্যোম-নব গতির জোয়ার। যার ধারাবাহিকতা আজও জারি আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

(৩) ১৯২৫ সালে তিনি দারুল কাযা গঠন করেন। যার কাজ হচ্ছে আহমদীদের বিভিন্ন বিষয় মীমাংসা করা।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) আহমদীদেরকেই যে শুধু সাংগঠনিকভাবে সুসংগঠিত করেছিলেন

তা নয়। জামাতের বাইরেও তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও বিচক্ষণতার ছাপ পড়েছে। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত হলো-

(১) হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-ই কাশ্মিরের জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা আদায়ের সংগঠন, 'অল ইন্ডিয়া কাশ্মির' কমিটি গঠন করেন। এবং ১৯৩১ সনে তিনি এর সভাপতিও ছিলেন।

(২) ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষেও তিনি অবদান রেখেছেন, খুতবা প্রদান করেছেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে সম্বোধন করে বলেছেন- **'২৫ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশ সম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছে। আর আজ তারা তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে। তোমাদের উচিত তাদের এ দাবীকে মানা।'** তাঁর এ বক্তব্যকেই পরবর্তীতে চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব যিনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে লর্ড ওয়াবেল গঠিত 'ভারতীয় স্বাধীনতা কমিশনের' প্রধান ছিলেন। তিনি তার হাউজ অব লর্ড এর ভাষণে প্রতিধ্বনিত করেন। এবং তখন অল ইন্ডিয়া রেডিও তা সম্প্রচার করে।

(৩) পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন উপমহাদেশের রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইংল্যান্ডে চলে যান, তখন মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এর নির্দেশে আমাদের লন্ডন মসজিদের ইমাম তাকে বুঝান এবং আবার পাকিস্তান আন্দোলনে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে জিন্নাহ সব সময়ই হুযূরের পরামর্শ নিতেন।

(৪) ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) ইহুদী-খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বকে সতর্ক করেছিলেন। ফিলিস্তিনে ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রি করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা শুনেনি। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে আবার মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। তারা তাও শুনেনি। ফলে আজ তাদের এ অবস্থা।

(৫) দেশ বিভাগের সময় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কে পন্ডিত নেহেরু এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন "আপনি ভারতে থাকেন, আমি আপনাকে ভ্যাটিকানের মত স্বাধীন রাষ্ট্র বানিয়ে দিব।" কিন্তু রাজনৈতিক নেতার মুখের আশ্বাস আর প্রলোভনে মুগ্ধ না হয়ে, পাকিস্তানে হিজরত করে আহমদী অধ্যুষিত, সুগঠিত, সুপরিকল্পিত আধুনিক শহর রাবওয়াহ্ গঠন করেন। এটি তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও দূরদর্শীতাকে প্রমাণ করে।

এখন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর কর্মময় জীবনের আরেকটি দিক তবলীগের দিকে দৃষ্টি দিব।

পূর্বেই বলেছি অত্যন্ত অল্প বয়সে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু শুরুতেই প্রচন্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এ বিরোধিতা জামাতের ভিতর বাইর উভয় দিক থেকেই হয়েছিল। জামাতের একটা বিশেষ অংশ মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের নেতৃত্বে যাদেরকে লাহোরী জামাত বলা হয় তারা তাঁর খিলাফতকে অস্বীকার করে এবং জামাত থেকে পৃথক হয়ে যায়। ফলে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-কে একদিকে লাহোরী জামাত, অন্যদিকে সারা দুনিয়ার মুখালেফাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে- আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের দাওয়াত পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌছানোর কাজ করতে হয়েছে। আর পৃথিবীর ইতিহাস আজ সাক্ষী তিনি আল্লাহ্তায়ালার অপার অনুগ্রহ ও ফযলে অত্যন্ত যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করেছেন। যার কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

(১) হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে ১৯১৪ সনে ইংল্যান্ডে তবলীগী কেন্দ্র চালু হয়। এবং ১৯২৪ সনে লন্ডন ফযল মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। যে মসজিদে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯১৫ সালে শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে, ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯২১ সালে সিয়েরালিওন, ঘানা, নাইজেরিয়া ও বুখারাতে তবলীগি কেন্দ্র চালু হয়।

(২) জিন্দিগী ওয়াক্ফ করে জামাতের খেদমত করার জন্য হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) জামাতের সদস্যদেরকে ১৯১৭ সালে আনুষ্ঠানিক আহবান জানান। এবং সর্ব প্রথম নিজে তাঁর ১৩ সন্তানকে ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করেন। তিনি ওয়াক্ফকৃত কিশোর ও যুবকদের শিক্ষার জন্য ১৯২৮ সালে জামেআ আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

(৩) জামাতে আহমদীয়ার এ ক্রমবর্ধমান প্রসারতা ও উন্নতি দেখে কংগ্রেসের মদদপুষ্ট, 'মজলিসে আহরারের' মোল্লারা ১৯৩৪ সালে সারা দেশব্যাপী আহমদী বিরোধী এক আন্দোলনের সূচনা করে। আর ঘোষণা দেয় "আমরা জামাতে আহমদীয়ার কেন্দ্র কাদিয়ানের প্রতিটি ইট খুলে নিব। আর এ জামাতকে নিশ্চিহ্ন করে দেব।"

যে মিশনকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাঠান তাকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। অপরিণামদর্শী মানুষ শুধু সীমালঙ্ঘনের স্পর্ধাই দেখাতে পারে। তাদের এ ঔদ্ধত্যের যথাযথ প্রতি উত্তর দেয়ার

জন্য হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এ বছরই ঘোষণা দেন ঐতিহাসিক 'তাহরিকে জাদীদের'। যার উদ্দেশ্য হলো, দেশে দেশে মুবাল্লেগ প্রেরণের মাধ্যমে সারা বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াতকে ছড়িয়ে দেয়া। আর এ তাহরিকে জাদীদ সম্পর্কে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন--

"এই তাহরিকের উদ্দেশ্য সাময়িক নয়, আমাদের কর্মসূচী আমরা নিজেরা তৈরী করিনি। বরং আমাদের কর্মসূচী আমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রণয়ন করেছেন।"

জগত সাক্ষী এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। তাঁর জীবদ্দশাতেই মজলিসে আহরার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে জামাতে আহমদীয়া ৪৬টি দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ দেশগুলোতে ৩১১টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ১৬৪ জন মুবাল্লেগ ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন। পৃথিবীর কোণায় কোণায় আহমদীয়াতের পয়গাম পৌছানো হয়েছে। এমন কি যে স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে বিতারিত করা হয়েছিল সেই স্পেনে ১৯৪৫ সালে মৌলানা করম এলাহী জাফর সাহেবকে আহমদীয়াতের পয়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তাঁর দোয়া ও প্রচেষ্ঠায় পরবর্তীতে সেখানে মিশন প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

আর আজ সারা বিশ্বব্যাপী জামাতে আহমদীয়ার যে প্রসারতা ও দৃঢ় অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে তা এ তাহ্‌রিকে জাদীদের কল্যাণেই হয়েছে।

(৪) বিরুদ্ধবাদীরা বিশ্বব্যাপী জামাতে আহমদীয়ার অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার জন্য পাকিস্তান থেকে জামাতে আহমদীয়াকে মিটিয়ে দিতে চায়। ১৯৫৩ সালের এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মাওলানা মওদুদী। পাঞ্জাবের দাঙ্গা নামে খ্যাত এ আন্দোলনে হাজার হাজার নিরপরাধ আহমদী শহীদ হন। তাদের রক্তে পাকিস্তান রঞ্জিত হয়। তাদের আর্তনাদে পাকিস্তানের বাতাস ভারি হয়ে উঠে। তখন মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) আহমদীদেরকে সম্বোধন করে ঘোষণা করলেন-

"ভয় পেয়ো না! আমি খোদাতায়ালাকে আমাদের সাহায্যের জন্য দৌড়ে আসতে দেখেছি।"

আর তাই হয়েছিল। আহমদীরা শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু জামাতের প্রসারতা ও উন্নতি থেমে থাকেনি। ১৯৫৭ সালে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) জামাতের প্রসারতা ও উন্নতির আরেকটি মাইল ফলক "ওয়াক্‌ফে জাদীদের" সূচনা করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান (তখন বাংলাদেশ এক সাথে ছিল) ও ভারতের আহমদী সদস্যদের তালীম তরবিয়তের মান উন্নত করা। দেশীয় পর্যায়ের প্রতিটি স্থানে আহমদীয়াতকে ছড়িয়ে দেয়া। এখন এ তাহ্‌রিক বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

(৫) এছাড়াও হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-ই ভারতের উত্তর প্রদেশের হিন্দুরা ১৯২২ সালে যখন "শুদ্ধি" আন্দোলনের নাম দিয়ে মুসলমানদেরকে জোড় পূর্বক হিন্দু বানাচ্ছিল, তখন এর প্রতিরোধ করেন। জিহাদের ডাক দেন। আহমদী যুবকদেরকে তবলীগের জন্য সেখানে পাঠান। তাদের তবলীগে ধর্মত্যাগীরা ফিরে আসে এবং হিন্দুরা সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়।

লিখনী ও প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ততা ছিল হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর কর্মময় জীবনের আরেকটি দিক। তিনি সুলতানুল কলম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যোগ্যতম উত্তরাধিকারী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-তাঁর সবুজ ইশতেহারে লিখেছেন-

"সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাশীল ও হৃদয়বান হবে। এবং তাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে।"

বাস্তবিক তিনি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সাথে ছিল আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত, ফযল ও ঐশী জ্ঞানের ছায়া। যার সুষ্ঠ ছাপ পড়েছে তাঁর কর্মে, তাঁর লিখনীতে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ২২৫টি ছোট বড় বই লিখেছেন। এ ছাড়াও ১৯১৩ সনের আল ফযল পত্রিকা প্রকাশ করেছেন ও ১৯৫৫ সনে তারিখে আহমদীয়াত (আহমদীয়াতের ইতিহাস) সংকলনের জন্য ইতিহাসবিদ মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেবকে দায়িত্ব দেন। জগত সাক্ষী তাঁর লিখার শক্তি ছিল তাঁর যুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অতুলনীয়। তাঁর লিখার জ্ঞান, গভীরতা, সূক্ষ্মতা, বিচক্ষণতা ও ব্যাপকতা শুধু আহমদীদের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রেখে দিয়েছে জাগতিক ও ঐশী জ্ঞানের এক বিশাল সমুদ্র। আমি এখানে তাঁর কোন কোন কিতাবের কথা বলবো-দাওয়াতুল আমীর, মালায়কাতুল্লাহ্, ইসলামমে এখতেলাফাত কা আগায, হাস্তিবারিয়াতালা, সায়রেরূহানী, দিবাচা তফসীরুল কুরআন, ফাযায়েলে কুরআন, তফসীরে সগীর ও তফসীরে কবীর-সবই ছিল তাঁর জাগতিক জ্ঞান, কুরআনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মীয় জ্ঞান এবং খোদা প্রদত্ত ঐশী জ্ঞানের উজ্জ্বলতম বহিঃপ্রকাশ।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর কর্মময় জীবনের আরো অনেক দিক রয়েছে। আর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কর্মময় জীবন এটাই প্রমাণ করেছে-জামাতে আহমদীয়ার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য, উন্নতির জন্য, প্রসারতার জন্য যে পরিবর্তন আনার দরকার ছিল আল্লাহ্ তাঁকে বুঝিয়েছেন এবং তিনি তা করেছেন। তাঁর কর্মময় জীবন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীরই সার্থক রূপায়ন ছিল, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার উজ্জ্বলতম নমুনা ছিল। জগত এর সাক্ষী, আমরা এর সাক্ষী, সাক্ষ্য দিবে অনাগত কালে আগত লোকেরা।

- শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমিন

কবিতা

"মুক্তি"

মুক্তি দাও হে প্রভু! মুক্তি দাও মোরে
তপ্ত পাপে সিক্ত দেহ পড়িয়া গুঞ্জনে
জগতের পরশ পাইয়াছি বটে নয়ন তৃপ্ত তাতে
রসনার চাপে সাধ ভুলে যাই, কে যেন আমায় ডাকে।
সাধনে ভোজন করি তৃপ্তি নাহি পাই
অন্ধে প্রেম খুঁজে বেড়াই পথের দিশায়
আমার তো সবি আছে, নাই কি? মুক্তি
মুক্তি দাও হে প্রভু! মুক্তি দাও মোরে।
শুনিয়া মমতার বানী অর্জিব তাঁকেই আমি
সাধু সন্ন্যাসী বেশে পথে পথে ধাই
রুদ্ধদ্বার বসিয়া কাতর আঁধার নামিছে ধেয়ে
ক্ষণকাল পরে হেলিয়ে সূর্য আমায় মুক্তি দে।
প্রান্তে, নদীর ধারে বসিয়া স্বজন কাঁদে
মুক্তি দাও হে প্রভু, মুক্তি দাও তারে।
ধরণীর গহ্বরে মিলাই আপন ঠাঁই,
ওগো প্রেমময়! মুক্তির টানে লয়ে যায় তোর ধারে
আলোর পিয়াসী আমি আঁধারে মুহ্যমান
মনের কালিমা দূর কর হে নূর! আমায় মুক্তি দাও
আমার নাকি সাধ আছে, রাঙ্গা প্রভাতে বিকেল বেলায়
কলরব স্থলে অবাক, এ আবার কোন দেশ?
ঘর-বাড়ি, দুঃখ-বেদনা সাধ আছে নাই? মুক্তি দাও হে প্রভু!
মুক্তি দাও আমায়।

-শরীফ আহমদ আফ্রাদ

আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলী

(৮১তম জলসা সালানার প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তব্য)

২৩) তিনিই আল্লাহ্! যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সব বিষয়ে জ্ঞাত। তিনি অযাচিত অসীম দানকারী বার বার দয়া প্রদর্শক।

২৪) তিনিই আল্লাহ্, যাঁকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, পরম শান্তিময়, পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানকারী, সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, মহা পরাক্রমশালী, প্রবল প্রতিবিধায়ক, অতীব গরীয়ান। তারা যে শিরক করে তাঁকে আল্লাহ্ তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

২৫) তিনিই আল্লাহ্, একমাত্র স্রষ্টা, আদি সুনিপুণ সৃষ্টিকারী, সর্বোত্তম আকৃতিদাতা। সুন্দরতম নাম ও গুণাবলী একমাত্র তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-ই আছে সবই তাঁর গুণ ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর ঃ ৫৯ঃ২৩-২৫)।

মহান আল্লাহ্ এ জগতের সবচেয়ে বড় সত্য আর একই সাথে তিনি সবচেয়ে গোপনীয়। তিনি জগতের সবচেয়ে দামী সম্পদ। তুচ্ছ এক সৃষ্টি হয়েও তর্কবাগিশ মানুষ তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে। তিনি যে আছেন এর প্রমাণ কি? নানাভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়। আমি অতি সংক্ষেপে এ প্রশ্নটিকে তুলে ধরছি।

(১) আমরা প্রত্যেকে অন্তরের অন্তঃস্থলে এক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী খোদার বিশ্বাস বা ধারণা লালন করি। বাহ্যত আমরা আস্তিক হই, নাস্তিক হই, বামপন্থী হই, ডানপন্থী হই, মৌলবাদী হই, প্রগতিশীল হই, সবার মনের ভিতরে কিন্তু এই সত্য প্রোথিত আছে। আল্লাহ্ নিজে এই বিষয়টিকে বর্ণনা করেছেন। তিনি রূপক ভাষায় বলেছেন, আদম সন্তানদের তিনি প্রশ্ন করেছেন, আয়াত ...

অর্থাৎ, "সৃষ্টির সূচনাতে আল্লাহতায়ালা মানব হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এক অদ্বিতীয় স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছেন।"

এই বিষয়টিকে আরেকভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা বর্ণনা করেছেন।

"মানুষ যখন অসহায় নিঃস্ব হয়ে যায়, চরম বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে- যেমন, সমুদ্রে ভ্রমণরত অবস্থায় হঠাৎ যখন সামুদ্রিক ঝড় তাকে ঘিরে ফেলে সে সময় মানুষ যে মহান সত্তাকে আকুতি-মিনতি সহকারে ডাকে তিনি হলেন আল্লাহ্। এই আকুতি-মিনতির ক্ষেত্রে আস্তিক-নাস্তিকের কোন প্রভেদ নেই। সবার অন্তরই তখন সেই মহান সত্তাকে সাহায্যের জন্য আকুতি জানায়। (২) আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের আরেকটি প্রমাণ হলো, এই বিশ্বাসের বিশ্বজনীনতা। হাজার হাজার লাখ লাখ বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানবগোষ্ঠী কোনো না কোনো নামে এক সর্বময় সত্তায় বিশ্বাসী। অথচ এসব মানবগোষ্ঠী যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেছে। এই বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও এরা সবাই একটি বিষয়ে একমত। আর তা হলো, মানবের উর্ধ্বে এক পরম সত্তা আছেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা মানবের কর্তব্য। এক অসীম সত্তায় বিশ্বাসী হবার ক্ষেত্রে মানবজাতির এই ঐক্যমত্য কোন মানবীয় যোগাযোগ বা প্রচার প্রচারণার ফলশ্রুতি নয় বরং জগতদ্রষ্টা নিজে তাদের অন্তরে এ সত্য গেঁথে দিয়েছেন। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মানবজাতির বিভিন্ন অংশে বা গোষ্ঠীতে এই এক-অদ্বিতীয় খোদার প্রতি বিশ্বাস-তাঁর মহান অস্তিত্বের এক শক্তিশালী প্রমাণ।

(৩) আরেকটি আঙ্গিকে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ও জাতিতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি স্বরূপ নবী রসূলরা আগমন করেছেন। তাঁদেরকে আমরা পরবর্তীতে যে নামেই আখ্যা দেই না কেন, তাদেরকে ঋষি, মুনি, অবতার, পয়গম্বর, নবী বা রসূল যে নামেই আখ্যায়িত করি তাঁদের মূল ভাষা ও প্রচারণা কিন্তু ছিল এক ও অভিন্ন। তারা সবাই বলেছিলেন, আল্লাহ্ আছেন এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এবং একথাও স্বীকৃত, এই শিক্ষা প্রচারকারী নবী-রসূলরা নিজ নিজ সমাজ ও জাতিতে দাবীর পূর্ব থেকেই জাতির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি হিসাবে গণ্য ছিলেন। জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, একজন পুরুষের পিতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ যদি এক দুর্বল মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট বলে গণ্য হয়, একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির খুনী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যদি দুই তিনজন চাক্ষুস সাক্ষীর সাক্ষ্যদানই যথেষ্ট হয়ে থাকে, তবে জগতের স্বীকৃত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ঋষি, নবী-রসূলদের সাক্ষ্য এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণে যথেষ্ট নয় কি?

(৪) আরেকটি দিক লক্ষণীয়, এবং তা হলো, কর্ম দ্বারা কর্তার অস্তিত্ব নিরূপন করা জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি স্বীকৃত উপায়। অর্থাৎ একটি টেবিল যদি কাঠ মিস্ত্রির অস্তিত্বের প্রমাণ হয়ে থাকে, মরুভূমিতে একটি মানুষের পদচিহ্ন যদি পথিকের সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে এই বিশাল পৃথিবী ও বিশ্ব-জগত আর এর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও এর সৃষ্টিনৈপুণ্য, এর নির্মাণশৈলী এসব কি এক মহান স্রষ্টার বিদ্যমানতা প্রমাণ করে না? (সূরা মূলক দ্রষ্টব্য)

(৫) মহান আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেই তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেননি। বরং সর্বস্রষ্টার সাথে ইতিবাচক এক যোগাযোগ বন্ধন প্রতিষ্ঠার পথ খোলা রেখেছেন। এই পথটির নাম হচ্ছে দোয়া। অর্থাৎ যে কোন সময় ও কাজে মানুষ তাঁর কাছে আকুতি জানাতে পারে। দোয়ার কবুলিয়ত আল্লাহ্‌র সত্তার একটি অকাট্য প্রমাণ। এর মাধ্যমে মানুষ বড় বড় নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে। দোয়ার মাধ্যমে মানুষ বাহ্যত অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখে। আর তখন সে জানতে পারে সত্যি সত্যিই এমন এক মহান অস্তিত্ব আছেন যিনি সবকিছুর মালিক। সবই তাঁর আয়াত্তাধীন, তা না হলে অসম্ভব সম্ভব হয় কিভাবে?

(৬) আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় ও অকাট্য প্রমাণ প্রদান করেন তাঁর প্রেরিত নবী রসূলদের মাধ্যমে। যুগে যুগে তাঁরা এসেছেন এবং প্রচলিত বিকৃত ধ্যান-ধারণা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে অমোঘ সত্যের ঘোষণা দিয়েছেন। জগত তাদের বিরোধিতা করেছে কিন্তু ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নবী-রসূলরাই জয়যুক্ত হয়েছেন। নবী রসূলরা এমনসব ভবিষ্যদ্বাণী করেন যা পূর্ণ হওয়া বাহ্যত অসম্ভব বলে মনে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদা তাঁর নিজ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সেগুলোকে পূর্ণতা দেন। খোদাতায়ালা তাঁদের মাধ্যমে জগতকে

নিজের বাণী শোনান এবং সেই বাণী যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন জগৎ জানতে পারে সত্যি সত্যি এক ও অদ্বিতীয় খোদা আছেন। নবী রসূলরা প্রকৃত অর্থে খোদার দর্পণ হয়ে থাকেন। তাঁদের মাধ্যমে জগত খোদাকে চিনতে পারে।

(৭) এ যুগে অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের পরের কথা বলছি। এই সৌভাগ্যবান যুগে পবিত্র আল কুরআন আল্লাহ্‌তায়ালার মহান অস্তিত্বের এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এর ভাষা, গভীরতা পরিবেশিত তথ্য অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। এর পরিবেশিত জ্ঞান–চিরসত্য ও ভাস্বর। যতই দিন যাচ্ছে, সভ্যতা ও জ্ঞান উন্নতি করছে ততই এর অর্থাৎ কুরআনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য্য আরো প্রকাশিত হচ্ছে। এ এক আশ্চর্যগ্রন্থ! এর বাণী আমাদের প্রাণ ছুঁয়ে যায়। আমাদের বিবেক এই কথার সমর্থন করে। এই ঐশী গ্রন্থের পরিবেশিত অনেক তত্ত্ব ও তথ্য এখন জগত স্বীকৃত। আল কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী একের পর এক পূর্ণ হয়ে চলেছে। আল কুরআনের অপরিবর্তনীয় ও অবিকৃত থাকাটাও আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ।

আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব প্রসঙ্গ শেষ করে আমি এখন আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রসঙ্গে যাচ্ছি। প্রথমেই আল্লাহ্ সম্বন্ধে -

"আমাদের খোদা হলেন সেই খোদা যিনি আজও তেমনই জীবিত যেমনটি তিনি অতীতে ছিলেন। তিনি আজও সেভাবে কথা বলেন যেভাবে আগে বলতেন। তিনি আজও সেভাবে শোনেন যেমন তিনি পূর্বে শুনতেন। তিনি এ যুগে শোনেন ঠিকই কিন্তু কথা বলেন না-এই ধারণা খুবই অলীক। বরং তিনি শোনেন এবং কথাও বলেন। তাঁর গুণাবলী আদি এবং চিরস্থায়ী, তাঁর কোন একটি গুণও অকার্যকর নয় এবং তা কখনও হবেও না। তিনি সেই এক-অদ্বিতীয় সত্তা যার কোন পুত্র নেই আর কোন স্ত্রী নেই। তিনিই সেই তুলনাহীন অস্তিত্ব যার কোন দ্বিতীয় নেই আর তাঁর মত মৌলিক গুণে অন্য কেউ গুণান্বিত নয়, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। তিনি দূরে থাকা সত্ত্বেও নিকটে আর নিকটে থাকা সত্ত্বেও তিনি দূরে। তিনি রূপক আকারে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে নিজ সত্তা প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু তাঁর কোন দেহ নেই আর কোন আকারও নেই। তিনি সবার উর্ধ্বে কিন্তু তাঁর নিচেও কেউ আছে-একথা বলা যায় না। তিনি আরশে সমাসীন কিন্তু তিনি পৃথিবীতে নেই-একথা বলা যায় না। তিনি সমস্ত পূর্ণাঙ্গীন গুণাবলীর সমষ্টি আর সমস্ত সত্যিকার প্রশংসার বিকাশ, তিনি সব গুণের উৎস আর সব শক্তির অধিকারী। যাবতীয় কল্যাণ ও আশীষ তাঁর কাছ থেকে উৎসারিত আর সবকিছুর তিনিই প্রত্যাবর্তনস্থল। তিনি প্রতিটি সাম্রাজ্যের সর্বাধিপতি। তিনি সব ধরনের উৎকর্ষে সুসজ্জিত আর প্রত্যেক দোষ ও দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত। পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীরা যে কেবল তাঁরই ইবাদত উপাসনা করবে এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র তাঁরই। তাঁর পক্ষে কোন কাজই অসম্ভব নয়। সমস্ত আত্মা ও এর যাবতীয় শক্তি, সমস্ত অণু-পরমাণু ও এগুলোর শক্তি তাঁরই সৃষ্ট। তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই প্রকাশিত হতে পারে না। তিনি নিজ শক্তি, অপার ক্ষমতা ও নিদর্শনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন। আমরা তাঁকে তাঁরই মাধ্যমে লাভ করতে পারি। তিনি সব সময়ে পুণ্যবানদের কাছে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করে থাকেন এবং তাদেরকে নিজ কুদরতের মহিমা প্রদর্শন করেন। তাঁরই মাধ্যমে তাঁকে সনাক্ত করা হয়ে থাকে আর তাঁরই মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টির পথ চেনা যায়।

তিনি বাহ্যিক চোখ ছাড়াই দেখেন আর বাহ্যিক কান ছাড়াই শোনেন আর বাহ্যিক জিহ্বা ছাড়াই কথা বলেন। একইভাবে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান করা তাঁরই কাজ। (আল ওসিয়ত পুস্তিকা)

আল্লাহ্‌তায়ালার অনেকগুলো গুণ আছে। আমি মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করছি-

তাঁর একটি গুণ হচ্ছে তিনি **'রব'** তিনি **রাব্বুল আলামীন**। রব' শব্দের অর্থ স্রষ্টা, লালন-পালনকারী, অভিষ্ট মার্গে উপনীত করার পর জীবের বা জিনিষের অবসানকারী। এই বিষয়ের বিশালতাকে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। কোন কথাটি বলব আর কোনটি বাদ দিব বুঝি না। মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের কথা বলব, তার লালিত পালিত হয়ে বিভিন্ন স্তর পাড়ি দেয়ার কথা বলব, নাকি তার উৎকর্ষের উচ্চতম মার্গে উপনীত হওয়ার কথা বলব? এই একটি প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গেলে আমার বক্তব্যের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে। গাছের কথা বলি- একটি বীজ, তার ভিতরে লুকিয়ে থাকে একটি মহীরুহ। পানি পেলে, মাটি পেলে এর অঙ্কুরোদগম হয়। একান্ত নরম, জীর্ণ অবস্থা পাড়ি দিয়ে সেটা ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়। আবার নিজের আয়ু ফুরিয়ে গেলে সেই গাছ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। আল্লাহ্ বলছেন, গাছ মরে যাবার পর সেটা তোমাদেরকে আগুন বা জ্বালানী সরবরাহের উপকরণে পরিণত হয়। কি আশ্চর্য আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টি মহিমা! যার সূচনা হয়েছিল পানি থেকে সেই জিনিস আগুনের রূপও ধারণ করতে পারে! অথচ আগুন এবং পানি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী জিনিস। সূরা ইয়াসীন এর শেষ ভাগে একথার উল্লেখ আছে।

আল্লাহ্‌র একটি প্রধান গুণ তিনি **'রহমান'**। তিনি অযাচিতভাবে দান করেন এবং অসীম দান করেন। রহমান খোদা তিনি যিনি না চাইলেও দেন আর অনেক দেন। এত দেন যে মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। আমাদের জীবন ধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন আমাদের জন্মের আগেই তিনি সেসব সৃষ্টি করেছেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েছেন।

তাঁর একটি গুণ তিনি **'রহীম'**। তিনি মানুষের কর্মকে গ্রহণ করে অধিক পরিমাণে ফলাফল দান করেন এবং বার বার দান করেন। রহমান গুণের সাথে কর্ম বা চেষ্টা-প্রচেষ্টার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু রহীম গুণের সাথে মানুষের কর্ম ও প্রচেষ্টার একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। আলো, বাতাস, পানি এ বিশ্বজগতের প্রতিটি গ্রহ, নক্ষত্র, মায়ের মমতা, মাতৃদুগ্ধ এসবই হলো রহমান খোদার দান। আর কর্ম প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে আমরা বার বার অধিক পরিমাণে যে সমস্ত ফলাফল লাভ করে থাকি এগুলো হলো খোদার রহীম গুণের বহিঃপ্রকাশ। যেমন শৈশবে আমরা যখন অক্ষরজ্ঞান লাভ করি, তখন একবারই ভালভাবে পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু এই পরিশ্রমের ফলাফল ছাত্রজীবন কর্মজীবনসহ জীবনভর ভোগ করি। একজন কৃষক অল্প কয়েকটি বীজ বপন করে কিন্তু এই পরিশ্রমের ফলে সেই বীজের তুলনায় সাত'শ গুণ কিংবা তারও বেশি ফসল ঘরে তুলে। আবার এক ফসলের উদ্বৃত্ত একটি অংশ থেকে ভবিষ্যত ফসলের বীজও সে লাভ করে। এই হলো রহীম খোদার দয়ার বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেক ধার্মিক বিশ্বাসী আল্লাহ্‌তায়ালার এই গুণের উপর নির্ভর করে তাঁর প্রচেষ্টা আরম্ভ করে থাকেন আর আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর অপার কৃপায়

বংশ পরম্পরায় তার এই নেক প্রচেষ্টার সুফল প্রকাশ করতে থাকেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর ভাষায় **"আগায তো ম্যাঁয় কার দু আঞ্জাম খোদা জানে।"** আমি কাজটা আরম্ভ করে দেই। এর ফলাফল ও পরিণাম আল্লাহ্‌র হাতে।

খোদার আরেকটি গুণ বাচক নাম **'খালেক'**। তিনি স্রষ্টা। আর সৃষ্টি এত বিশাল বিস্তৃত যে তার চিন্তা করাও আমাদের জন্য দুষ্কর। এক মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে তিনি আমাদের এই পরিচিত জগতের সূচনা করেছিলেন। এক হিসেব অনুযায়ী এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য মোতাবেক এ জগতের বিস্তৃতি ১৮ বিলিয়ন আলোকবর্ষ এবং এটা ক্রমবর্ধমান। অর্থাৎ এক ব্যক্তি যদি আলোর ঘাড়ে বসে যাত্রা আরম্ভ করে এবং প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে তার যাত্রা অব্যাহত রাখে তাহলে ১৮০ কোটি বছরে সে আলোক রশ্মি যে দূরত্ব অতিক্রম করবে বর্তমান আবিষ্কার জগত ততটুকু বিস্তৃত। তবে এর এখানেই শেষ নয়।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলছেন তাঁর একটি গুণ হল **'ওরা ইন্না লামুসেউন'** আমি শক্তিশালী এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই জগতকে সৃষ্টি করেছি কিন্তু একে স্থির অবস্থায় রেখে দেইনি বরং আমি একে ক্রমাগত বিস্তৃতি দান করে চলেছি। অর্থাৎ আলোর ঘাড়ে চড়ে ১৮০ কোটি আলোকবর্ষ অতিক্রম করার পর দেখা যাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জগত ততদিনে হয়ত আরো ১৮০ কোটি আলোকবর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে।

আমাদের খোদা এত ক্ষমতাবান, এত শক্তিশালী, এত বড় যে তাঁর সৃষ্টির বিশালতাকে আমরা কোন হিসাবে আনতে পারি না বরং এর ধারণা করতেও আমরা অক্ষম।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা আর এক বিস্ময়কর গুণের উল্লেখ করে। আল্লাহ্ বলছেন, **"ইন্নাহু হুয়া ইয়ুবদেয়ু ওয়া ইউয়িদ।"** অর্থাৎ তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং এর পুনরাবৃত্তিও ঘটান। অর্থাৎ এই বিশাল সৃষ্টিকে মুছে দিয়ে তিনি আবার নতুন এক জগত সৃষ্টি করবেন। কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ অস্তিত্বের নিদর্শন হিসাবে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকে তুলে করেছেন। বলেছেন, **"আফিল্লাহে শাক্কুন ফাতিরিস সামাওয়াতে ওয়াল আরয"** অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি সন্দেহ থাকতে পারে যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা? প্রবন্ধের ধৈর্য্য সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য এই প্রসঙ্গটির এখানে ইতি টানছি।

আরেকটি গুণের কথা বলি। তিনি হলেন **'ওয়াদুদ'**। মানুষের জন্য প্রেমময় তিনি। মানুষকে তিনি নিজ রহমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই দয়া এবং কৃপার অংশীদার হবার কারণে আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে শত দুর্বলতা এবং অবাধ্যতা সত্ত্বেও বার বার সংশোধনের সুযোগ দেন। তিনি চান তার বান্দারা যেন তাঁর কাছে ফিরে আসে, খোদামুখী হয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ কথা আমাদেরকে নানাভাবে বুঝিয়েছেন। বলেছেন, অনুতপ্ত হয়ে নিজ সংশোধনে সচেষ্ট বান্দার উপমা সেই উটের মতো যার পিঠে সমস্ত বোঝা চাপিয়ে এক পথচারী মরুভূমির পথ অতিক্রম করে। ক্লান্ত সেই পথিক এক পর্যায়ে তার পাশে উটটাকে রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখে তার উটটি সেখানে আর নেই। মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে শেষ পর্যন্ত সে তার হারানো উট খুঁজে পায় না। ক্লান্ত পিপাসার্ত পথিক নিরাশ হয়ে আবার পূর্ববর্তী স্থানে ফেরত আসে এবং নিজের মৃত্যুর প্রহর গুণতে গুণতে এক পর্যায়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। হঠাৎ সে চোখ খুলে দেখে তার হারানো উট তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে! সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে আরম্ভ করে। মহানবী (সঃ) বলেছেন, এই পথিক তার হারানো উট ফিরে পেয়ে যতটা আনন্দিত হয় তোমাদের আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তওবাতে অর্থাৎ সংশোধন ও অনুশোচনাসহ তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে এই পথিকের চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।

আল্লাহ্‌তায়ালার একটি গুণ তিনি **'গফুর'** অর্থাৎ ক্ষমাশীল। আমাদের প্রত্যেকে একথার সাক্ষী। আমরা আমাদের জীবনে অগণিত পাপ ও দুর্বলতা সত্ত্বেও যতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি একমাত্র তাঁর ক্ষমা এবং গাফ্‌ফারিয়াতের কারণে তা সম্ভব হয়েছে। তিনি যদি আমাদের দোষ ও অবাধ্যতার কারণে শাস্তি প্রদান করতেন তাহলে কবেই আমাদের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত। কুরআন শরীফে এবং হাদিসে আল্লাহ্‌র এক বিশেষ গুণের বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে। সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে কেবল কুরআনের একটি আয়াতই উল্লেখ করছি। সুরা যুমার **"কুল ইয়া ইবাদিল্লাযিনা আসরাফু আলা আনফুসেহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগাফিরযুনুবা জামিয়া ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহীম।"** আল্লাহ বলেছেন, হে মুহাম্মদ! তুমি আমার সে সব বান্দাকে সম্বোধন করে বলে দাও যারা নিজেদের প্রতি অনাচার করেছে, তোমরা আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা সমস্ত পাপ ক্ষমা করতে পারেন। নিশ্চয়ই তিনিই পরম ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

আমাদের আল্লাহ্ ক্ষমার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্তবাদ বা জন্মান্তরবাদের মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ্ মানুষের সত্যিকার অনুশোচনা ও নেক সংকল্পের কারণে তার সারা জীবনের পাপ ক্ষমা করে থাকেন। তিনি নিরানব্বই এর স্থলে এক'শ খুনের আসামীকেও ক্ষমা করতে পারেন। অত্যন্ত ব্যভিচারী, শিরকে নিমজ্জিত মানুষকেও তিনি ক্ষমা করতে পারেন এবং করে থাকেন, শর্ত একটিই-পূর্ণ অনুতাপ ও সৎ সংকল্প। গফুর খোদার কথা বলে শেষ করা যাবে না। এ পর্যায়ে যুগের ইমাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর একটি বক্তব্য উপস্থাপন করে এই প্রসঙ্গটি শেষ করব। তিনি বলেছেন, "আমরা পাপী আমাদের দোয়া কীভাবে গৃহীত হবে-একথা ভেবো না। মানুষ ভুল করে, কিন্তু দোয়ার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সে প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করে আর প্রবৃত্তিকে দমন করতে সক্ষম হয়। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক মানুষের মাঝে প্রকৃতিগতভাবে নিজ কু-প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করার শক্তি রেখেছেন। লক্ষ্য করে দেখো, পানির প্রকৃতিতে আগুন নেভানোর বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। পানিকে যতই উত্তপ্ত কর, আর গরম করতে করতে সেটাকে আগুন-গরম করে দাও তবুও যখনই তা আগুনে পড়বে তখন অবশ্যই তা আগুনকে নিভিয়ে দিবে। পানির স্বভাবে যেমন শীতলতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, মানব প্রকৃতিতেও তেমনই পবিত্রতা রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মাঝে আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্রতার বীজ বপন করে রেখেছেন। আমরা পাপে জর্জরিত-একথা ভেবে হতাশ হয়ো না। পাপের উপমা কাপড়ে লেগে থাকা ময়লার মত

আর তা দূর করা সম্ভব। তোমাদের স্বভাব যতই কুপ্রবৃত্তির অধীনস্ত হয়ে গিয়ে থাকুক, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকো। তিনি তোমাদের বিনষ্ট হতে দিবেন না। তিনি পরম সহিষ্ণু, তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (বদর পত্রিকা, ১৪ জানুয়ারী ১৯০৭, হুযূরের জলসার বক্তৃতা)।

আমাদের আল্লাহ্ 'আযীয' অর্থাৎ মহাপরাক্রমশালী। তিনি নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ সক্ষম। 'আযীয' খোদা সহায় সম্বলহীন এক মানুষকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে যখন বেছে নেন তখন নিজ গুণে তিনি সেই ব্যক্তিকে পদে পদে বিজয় ও সমর্থন দান করেন। আমাদের নবী বিশ্বনবী (সঃ) বাহ্যত এক সহায় সম্বলহীন ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা সেই দৈন্য অবস্থা থেকে তাঁকে কীভাবে পদে পদে সাহায্য করে বিজয়ী করেছিলেন। হিযরতের সময় 'সওর' গুহায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর সাথে তিনি এক কঠিন লগ্ন অতিক্রম করেন। শত্রু পক্ষ যখন গুহার দ্বারপ্রান্তে মহানবী (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীকে খুঁজছিল সেই পরীক্ষার কঠিন সময়ে ও তিনি অবিচল ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীকে সান্তনা দিয়ে বলেছিলেন, "লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা" মহা পরাক্রশশালী 'আযীয' খোদা তার বিশ্বস্ত নবী ও নবীর সঙ্গীকে এক মাকড়সার জালের বেষ্টনী দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। মহানবী (সঃ) তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে গেলেন। অথচ কুরআনের ভাষায় মাকড়সার জাল বা তার বাসা দুর্বলতম আশ্রয়। এই দুর্বলতম উপকরণ কাজে লাগিয়ে 'আযীয' খোদা তার সবচেয়ে মহান নবীকে রক্ষা করেছিলেন। আর আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, 'আযীয' খোদা দুর্বলতম উপকরণ ব্যবহার করেও নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্ষম। তোমরা উপকরণের উপর নির্ভর করো না বরং উপকরণের স্রষ্টা 'আযীয' খোদাকে আঁকড়ে ধর, তাহলে বিজয় তোমাদের সুনিশ্চিত। এ যুগেও মহানবী (সঃ) এর প্রকৃত প্রেমিক ও একনিষ্ঠ অনুসারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন "ইয়া আহমদি ইন্নি মা'য়াকা, ওয়ামাআ আহ্‌লেকা ওয়ামাআ কুল্লে মান আহাব্বাক" অর্থাৎ হে আমার প্রিয় আহমদ! আমি তোমার সঙ্গে আছি, তোমার পরিবার পরিজনের সাথে আছি এবং প্রত্যেক সেই ব্যক্তির সাথে আছি যে তোমাকে ভালবাসে। আমরা হযরত আকদাস ইমাম মাহ্‌দী (সঃ) এর মত খোদা ও রসূল প্রেমিক হতে পারিনি, তাঁর পরিবার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। কিন্তু খোদার কাছে আমরা একটি দাবী নিঃসন্দেহে করতে পারি। আর তা হলো, আমরা এ যুগে তাঁর প্রেমিক ও প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দীকে মানি এবং অন্তর দিয়ে ভালবাসি। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মহান আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। যতদিন আমরা আমাদের এই ঈমান এবং নিষ্ঠায় অবিচল থাকবো ততদিন আমাদের কোন ভয় নেই। এই জামাত মহান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক ঐশী জামাত। জগতের কোন শক্তি এই জামাতকে উৎখাত করতে পারবে না, ইনশাল্লাহ্।

হে আমার প্রিয় আহমদ! আমি তোমার সঙ্গে আছি, তোমার পরিবার পরিজনের সাথে আছি এবং প্রত্যেক সেই ব্যক্তির সাথে আছি যে তোমাকে ভালবাসে।

কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমি আল্লাহ্‌তায়ালার গুণবাচক নাম কাহ্‌হার, জাব্বার, যুলইনতেকাম শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত গুণবাচক নামগুলোর উল্লেখ করিনি কেন? এর উত্তর হলো, খোদার ভয়ে ভীত হয়ে আমি সেগুলোর উল্লেখ করিনি। মহানবী (সঃ) হাদিসে কুদসিতে বলে গেছেন, বান্দা তার আল্লাহ্ সম্বন্ধে যেরকম ধারণা পোষণ করে আল্লাহ্ বান্দার সাথে সে রকম আচরণই করে থাকেন। তাই এক অধম পাপী বান্দা হিসাবে আমি তাঁর রহমতের প্রত্যাশী, তাঁর উদারতা এবং বিশালতার আকাঙ্ক্ষী। তাই তাঁকে শাস্তিদাতা ও ভয়ঙ্কর ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বাস করেও ইচ্ছাকৃতভাবে আমি কেবল তাঁর দয়া ও কৃপার উল্লেখ করেছি। আমি তাঁর কাছে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি আর আশা করি তিনি আমার মত নগণ্য অধমদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করবেন।

পরিশেষে আমি যুগ ইমাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সেই অমোঘ বাণী শোনাতে চাই যা এক মৃত জগতকে জীবন দানের উদ্দেশ্যে আমাদেরকে শুনিয়ে গেছেন-

"আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য গুণরাজির অধিকারী। কিন্তু শুধু সেই ব্যক্তিই উহা দর্শন করতে পারে, যে সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাহার হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহার শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁহার সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত সেবক নহে, তাহাকে তিনি ঐ আশ্চর্য লীলাসমূহ প্রদর্শন করেন না। কত হত ভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আজও জানে না তাহার এইরূপ এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান! আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশ্‌ত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাহাকে দর্শন করিয়াছি এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য তাঁহার সাথে দেখিতে পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষিত হয়, তবুও ইহা ক্রয় করা উচিত। হে (খোদা লাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এই ঝরণার দিকে ধাবিত হও, ইহা তোমাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস যাহা তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়া বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করিয়া বলিব, 'ইনি হইলেন তোমাদের খোদা" এবং কোন ঔষধ দিয়া আমি চিকিৎসা করিব যাহাতে শুনিবার জন্য আমাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?

তোমরা যদি খোদার হইয়া যাও তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রিত থাকিবে এবং খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকিবেন, তোমরা শত্রু সম্বন্ধে বেখবর থাকিবে কিন্তু খোদা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং তাহার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। তোমরা এখনও জাননা যে, তোমাদের খোদা কত শক্তিশালী! যদি জানিতে, তাহা হইলে দিনেকের তরেও এই সংসারের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইতে না। যে ব্যক্তি ধনাগারের মালিক, সে কি কখনও একটি পয়সা নষ্ট হইলে বিলাপ ও চিৎকার করিয়া মরে? সুতরাং তোমরা যদি এই ধন ভান্ডার সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকিতে যে, খোদা তোমাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সময়ে কাজে লাগাবেন, তাহা হইলে সংসারের জন্য এরূপ আত্মহারা কেন হইতে? খোদা এক প্রিয় সম্পদ, তোমরা তাহার কদর কর। প্রত্যেক পদে তিনি তোমাদের সহায়ক। তিনি ব্যতিরেকে তোমরা কিছুই নহ এবং তোমাদের পার্থিব উপকরণ ও তদবীর কিছুই নহে।

মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
মুরব্বী সিলসিলাহ

আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম
(আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম)
হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)

(৯ম কিস্তি)

কুরআন করীমে অপর এক জায়গায় আল্লাহ্তায়ালা বলেন 'লা ইয়াসতাবিল যায়েদুনা মিনাল মু'মিনীনা গাইরু উলিয্ যারারে। (নিসা-১৩ রুকূ)। অর্থাৎ মোমেনদের মধ্য থেকে যারা ধর্মের খেদমত করে এবং সে সমস্ত লোক যারা ধর্মের খেদমত করে না এক সমান হতে পারে না। কিন্তু এমন কিছু লোক আছে যাদের উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ পতিত হওয়ার ফলে ধর্মের খেদমতে শিথিলতা দেখায়। এদের ব্যাপারে এই বিধান নয় যে, আল্লাহ্তায়ালা তাদের এই অপারগতাকে দৃষ্টিতে রাখবেন।

রসূলে করীম (সঃ) বলেন, 'মা ইয়াযালুল বালাউ বিল মু'মিনে ওয়াল মু'মিনাতে ফী নাফসিহী ওয়া মা আলায়হে খাতীয়াতুন। (তিরমিযী)।

মোমেন নারী পুরুষের উপর যে কোন বিপদই আপতিত হয় তা তাদের হৃদয়ের, সন্তান-সন্ততির বা সম্পদের ব্যাপারেই হোক এর প্রতিদানে তাদের পাপ কমতে থাকে এবং এ সকল কষ্ট সহ্য করার কারণে তার হৃদয়ে পবিত্রতার এমন এক ক্ষমতা সৃষ্টি হতে থাকে যার ফলে যখন সে আল্লাহ্তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ করবে, ততক্ষণে সে পবিত্র হয়ে যাবে। এখানে ধোঁকা যেন না লাগে, এই হুকুম শুধু মোমেনদের জন্য, প্রত্যেকে নিজ অধিকার অনুযায়ী উপকৃত হতে পারে। কুরআন করীমের সিদ্ধান্ত সকলের জন্য। হাদিসে যেহেতু মুসলমানদের প্রশ্নের উত্তরে এ বিষয়টি বলা হয়েছে তাই মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

এখন দেখুন একটি সিফতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ে কত মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম এর এক অর্থ নিয়েছে আর অন্যান্য ধর্ম এর অন্য এক অর্থ নিয়েছে। তারা সিফত রহম কে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য জন্মান্তরবাদের বিষয়টি পেশ করেছে। অথচ একটু চিন্তা করলে বুঝা যায় ইসলামের ব্যাখ্যা একেবারে স্বভাবগত ও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী এবং অন্যান্য ব্যাখ্যার ভিত্তি এমন কিছু বিষয়ের উপর রাখতে হয় যা প্রমাণিত নয়।

আল্লাহ্তায়ালার সিফত আদল ও রহমের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। সকল ধর্ম খোদাতায়ালাকে আদেল ও রাহীম উভয়কেই মানে কিন্তু ব্যাখ্যায় বিস্তর মতভেদ রয়েছে। ইসলাম বলে এই দু'টি সিফতে মতবিরোধ নাই। এগুলো একই সময়ে কাজ করতে পারে এবং করে। আদল, রহমের বিরুদ্ধে নয় বরং এর চেয়েও বেশি। কুরআন করীম বলে- 'মান যায়া বিল হাসানাতে ফালাহ্ আশরু আমসালেহা ওয়া মান জায়া বিসসাইয়েয়াতে ফালা ইউজযা ইল্লাহ্ মিসলুহা ওয়া হুম লা ইউযলামুল।' (আনআম ২)।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে সে দশ গুণ প্রতিদান পাবে আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে সে ততটুকুই পাবে যতটুকু সে কর্ম করেছে। আর তাদের উপর যুলুম করা হবে না।

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে কাউকে তার অধিকারের চেয়ে বেশি দিলে যুলুম নয় বরং তার অধিকারের বেশি শাস্তি দেয়া যুলুম। এতে কোন সন্দেহ নেই, কাউকে তার প্রাপ্য হক থেকে বেশি শাস্তি দেয়া অথবা তার হকের কম প্রতিদান দেয়া অথবা তার হক অন্যকে দিয়ে দেয়াকে যুলুম বলে। আর এমন কাজ আল্লাহ্তায়ালা কখনও করেন না।

না তিনি কখনও কাউকে তার হকের বেশি শাস্তি দেন, না তার প্রতিদান কমিয়ে দেন আর না তিনি কারো হক অন্যকে দিয়ে দেন। তিনি যা করেন তা হলো- এক অনুতপ্ত, লজ্জিত বান্দাকে যে নিজ অপরাধকে অনুভব করে তার মন্দ কর্মকে ছেড়ে এক ভীত হৃদয় এবং কম্পমান ওষ্ঠে এবং ঝরনার মত প্রবাহমান চোখ এবং অনুতাপে অবনতশিরের সাথে ভবিষ্যতের জন্য পূর্ণ পবিত্রতার চিন্তাধারা নিয়ে যে- সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উদ্দীপিত হয়ে, সুস্থ মস্তিষ্কে খোদাতায়ালার আরশে গিয়ে দাঁড়ায়, তাকে তিনি ক্ষমা করে নতুন জীবন শুরু করার সুযোগ দান করেন।

এবং সেই পিতার মত যার সন্তান নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গিয়েছিল এবং কিছু সময় পর লজ্জিত হয়ে ঘরে ফিরে এসেছিল এবং নিজের কৃতকর্মে এমন লজ্জিত ছিল যে, পিতার সামনে মাথা তুলতে পারছিল না, সেই পিতা ভালবাসার আবেগে আপ্লুত হয়ে তার বুকে জড়িয়ে নেয়। আর তাকে তিরস্কার করে না বরং তার ফিরে আসায় আনন্দিত হয়। তাহলে পিতার এই কাজে তার অন্যান্য যেসব ছেলেরা খেদমতে লেগে রয়েছিল, এখানে কি কোন অভিযোগের সুযোগ আছে? তাদের জন্য কি কোন ধরনের আপত্তির সুযোগ আছে? কখনও না।

নিঃসন্দেহে শাস্তি সংশোধনের একটি বড় মাধ্যম কিন্তু প্রকৃত অনুতাপ ও প্রকৃত লজ্জিত হওয়া থেকে দোযখের আগুন বেশি শাস্তি হতে পারে না। দোযখের আগুন লাখ বছরে যে কাজ করতে পারে প্রকৃত অনুতাপ সেই কাজটি মিনিটের মধ্যে করে ফেলে। আর যখন কেউ প্রকৃতভাবে নিজের গুনাহ্র উপর তওবা করে এবং পরবর্তীতে সংশোধন হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে খোদাতায়ালার সামনে উপস্থিত হয় তখন আল্লাহ্তায়ালার রহীমিয়্যাতের গুণ অনুযায়ী তিনি তাকে রহম করবেন। রহীম ও করীম খোদা কি তার এক অধম বান্দাকে–যে

আশা-আকাঙ্ক্ষার জ্বলন্ত নমুনা হয়ে এবং নিজের কাজ হতে বিমুখ হয়ে তাঁর রহমতের আস্তানায় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যায়,- তিরস্কার করবেন আর তিনি কি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন? না, কখনও না। পরিশেষে আমি সেই সিফতকে নিচ্ছি যা সকল সিফত হতে অধিক পরিচিত কিন্তু যার মাঝে ব্যাখ্যার দিক হতে সবচেয়ে বেশি মতবিরোধ আছে আর তা হলো- আহাদিয়াত এর সিফত। আজকাল দুনিয়াতে এমন কোন ধর্ম নেই যাতে দুই খোদা বা ততোধিক খোদায় বিশ্বাসী নেই। তৌহীদের ব্যাপারে সকল ধর্ম নীতিগতভাবে একমত হয়ে গেছে এমন কি, এক ধর্মের অনুসারীরা অন্য ধর্মের অনুসারীদের বিরুদ্ধে তর্ক যুদ্ধ চালায়, 'এরা পূর্ণভাবে তৌহীদে বিশ্বাসী নয়।' আমি ইউরোপিয়ান কিছু লেখকের বই দেখেছি যা স্পষ্ট প্রকাশ করে, মুসলমানরা মুশরেক আর আমি শুনেছি, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক অনেক লোক যারা ইসলামী লিটারেচার সম্বন্ধে অনবহিত তারা মনে করে মুসলমানরা রসূলে করীম (সঃ) এর পূজা করে বা ইবাদত করে যা থেকে বুঝা যায় সাধারণ লোকও এ বিষয়টি অনুভব করতে পারে, একাধিক খোদার ব্যাপারটি পেশ করা অসম্ভব। দুনিয়া এটাকে শুনতে প্রস্তুত নয়। তৌহীদ শব্দের উপর সকল ধর্মের একমত হওয়া সত্ত্বেও তৌহীদের ব্যাপারে সকলের মাঝেই মতবিরোধ রয়েছে। আর এমন অনেক ধর্ম আছে যেখানে, তৌহীদের নামের অন্তরালে বিভিন্ন ধরনের শির্ক লুকিয়ে আছে। কিন্তু ইসলাম শির্ক হতে পূর্ণভাবে মুক্ত, পবিত্র। ইসলাম সব ধরনের মুশরেকানা বিষয়ের মূলোৎপাটন করেছে। আর শির্কের প্রকৃত তত্ত্বকে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে যার কারণে কেউ ধোঁকায় পড়বে না। কুরআন করীম শির্ককে চার ভাগে বিভক্ত করেছে।

১) প্রথম শ্রেণীর শ্রীক হলো অংশীদার বানানো অর্থাৎ বিশ্বাস করে নেয়া, খোদার মত অন্য আরেকজন খোদা আছে যে তাঁর সত্তাগতভাবে শরীক।

২) দ্বিতীয়ত শরীক আখ্যা দেয়া, অর্থাৎ এটা মনে করা, কোন ব্যক্তি তাকে মাবুদ বানানো হোক বা না হোক আল্লাহ্তায়ালার সিফতের কিছু বা সবগুলো সিফতের সাথে শরীক। উদাহরণস্বরূপ ধরা যায়, অমুক ব্যক্তি সৃষ্টজীব বানাতে পারে অথবা মৃতকে জীবিত করতে পারে যদিও সবাই সে ব্যক্তিকে মানুষ বলে ও তার দিকে এসব বৈশিষ্টাবলী আরোপ করা হয় কিন্তু এটাও শির্ক হবে। কেননা এটা শুধু নামের পার্থক্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে সে ব্যক্তিকে খোদাই বলা হয়েছে।

৩) তৃতীয় ধরনের শির্ক হলো কাউকে ইলাহ বা উপাস্য বানানো অর্থাৎ খোদাকে ছাড়া অন্যকে ইবাদত করা যদিও তাকে খোদা নাই মনে করা হোক অথবা খোদাতায়ালার সিফতের শরীক বলে না মনে করা হোক যেমন প্রাচীন যুগে কিছু জাতির মাঝে মা বাবার ইবাদত করা হতো।

৪) চতুর্থ ধরনের শির্ক হলো কাউকে রব বা প্রভু আখ্যা দেয়া। অর্থাৎ কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বা পীরকে এমন মনে করা, এরা মানবিক দোষত্রুটি হতেও মুক্ত এবং তারা যা কিছুর হুকুম দিবে তা যত খারাপই হোক পালন করা আবশ্যক। আর কোন বান্দার কথাকে সে যত বড় ব্যক্তিত্বই হোক কার্যত খোদাতায়ালার কথার উপর প্রাধান্য দেয়া। যদিও বিশ্বাসগতভাবে তাকে খোদা না-ই মনে করা হোক।

কুরআন করীমে এই চার ধরনের শির্কের উল্লেখ এই আয়াতেই এসেছে- 'ইয়া আহলাল কিভাবে তায়ালাও ইলা কালেমাতিন সাওয়াইন বাইনানা ওয়া বাইনাকুম আল্লা না'বুদু ইল্লাল্লাহ্। ওয়ালা নুশরিকা বিহী শাইয়াও ওয়ালা ইয়াত্তাখিযা বা'মুনা বা'যান আরবাবাম মিন দুনিল্লাহে ফা ইন তাওয়াল্লাও ফাকুলুশহাদু বিআন্না মুসরেমুন। (আল্ ইমরান-৬ রুকূ)।

চিন্তা করা উচিত কিভাবে সব ধরনের শির্ককে তা ছোট হোক বা বড় এই সংক্ষিপ্ত কালামে একত্রিত করে দিয়েছেন। এই হুকুম অনুযায়ী যখন এক মুসলমান বলবে, সে এক খোদায় বিশ্বাসী তখন সে এই শব্দের সেই অর্থই নিয়ে থাকে যে ভাষায় এ অংশের যে অর্থ হয়। সে এক খোদা ছাড়া কারো ইবাদত করে না। সে তাঁর সিফ্ত অন্য কাউকে দেয় না। সে তাঁকে সব ধরনের আত্মীয়তার বন্ধন হতে পবিত্র মনে করে। ... সে তাকে মৃত্যু ক্ষুধা ও তৃষ্ণার আবেগ থেকে তা অবতীর্ণের দিক থেকেই হোক পবিত্র মনে করে। তার মাথা অন্য কারো সামনে ঝুঁকে না। সে দোয়া তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে সম্বোধন করে না। সে খোদার নবীদের সম্মান করে কিন্তু সে এদেরকে খোদার তুলনায় সাধারণ মানুষের মতই মানুষ মনে করে। ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় এবং তাকে আজীবন এই রাস্তায় চলার জন্য তাকীদ করে।

এখন মিলিতভাবে তো সকল ধর্ম এক সাথে খোদার তৌহীদে একমত কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনায় প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ অবলম্বন করে এবং এভাবে সকল ধর্মের মাঝে এক বিস্তর দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়।

মোট কথা আল্লাহ্তায়ালার বৈশিষ্ট্যাবলীর ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা পরিপূর্ণ। ... এই তালীমের মাধ্যমে খোদাতায়ালার জন্য মানুষের মনে সে আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে অন্য কোন ধর্মের মাধ্যমে সেই আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে না।

আর এর বৈশিষ্ট্য হলো ইসলাম বিশদ বর্ণনার সাথে প্রত্যেক সিফতের উল্লেখ করে। আর নিত্য জীবনের অবস্থার উপর এর যে প্রভাব পড়ে তাও বর্ণনা করে। এবং বিভিন্ন সিফতের পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক ও এগুলোর গন্ডিকেও বর্ণনা করে–এমনকি খোদাতায়ালার প্রকৃত অস্তিত্ব বান্দার জ্ঞান-চক্ষুর সামনে এস পড়ে। আর তার হৃদয় খোদার প্রতি ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে ঝুঁকে যায়। এর সাথে সিফাতে ইলাহিয়ার বর্ণনা করায় যাতে অন্যান্য ধর্মও শরীক তা শুধু নামই–প্রকৃত সত্য নয়। অথচ কোন জিনিসের মূলই হলো প্রকৃত সত্য শুধু নাম নয়।(চলবে)

অনুবাদ- মোহাম্মদ সোলায়মান

বঙ্গীয় আহমদী জামাতের প্রতি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বাণী

(১৯২৭ইং সনে লিখিত)

বঙ্গীয় আহমদী জামাতের ভ্রাতৃবৃন্দ

গত বছর এবং এ বছরও আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ও হিব্বি ফিল্লাহ্ (প্রিয় বন্ধু) চৌধুরী আবুল হাসেম খাঁ সাহেব এম. এ. আমার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন যে, আমি যেন আপনাদের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ পত্র প্রেরণ করি যার মধ্যে আপনাদিগকে আপনাদের কর্তব্য সমূহের সম্পাদনের আত্মনিয়োগের প্রতি এবং আপনাদের আত্মসংস্কারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমার উক্ত ভ্রাতার এই আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত নেক এবং বা-বরকত ছিল। এ জন্য আমি তাহার সাথে ওয়াদা করেছিলাম যে, আমি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ করার চেষ্টা করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহুবার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও গত বছর এমন কতক ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয় যে এ ইচ্ছাটিও পূর্ণ করবার সুযোগ পেয়ে উঠনি। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার সকল প্রশংসা যে, আজ আমি সে ওয়াদা যা আমি চৌধুরী সাহেবের নিকট করেছিলাম এবং সে ইচ্ছা এবং সংকল্প যা আমি গ্রহণ করেছিলাম, পূর্ণ করার তৌফিক পাচ্ছি।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আমি এই মত বার বার প্রকাশ করছি যে, আমার বিবেচনায় বাংলাদেশ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম প্রচারের জন্য দুনিয়ার উৎকৃষ্টতম ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে একটি। আমি দেখতে পাই যে, আপনাদের দেশের উপর আল্লাহ্তায়ালার এমনই কৃপা যে, আপনাদের দেশের মানুষ অত্যন্ত সরল প্রকৃতির এবং সত্যকে কবুল করার জন্য সম্ভবত আগ্রহী। এবং এ সরলতার সঙ্গে তাদের মন ও মস্তিষ্ক জ্ঞান ও তত্ত্বকে আহরণ ও আয়ত্ত করার যোগ্যতাও রাখে। যে জাতির মধ্যে উক্ত দুটি গুণ সন্নিবেশিত হয় তাঁহাদের সৌভাগ্য ও সফলতা এক প্রকার সুনিশ্চিত হইয়া থাকে।

আমি যখন দেখি, পাঞ্জাবের পরে যে দেশে ইসলাম সবচাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে তা হল আপনাদেরই দেশ, তখন আমার নিজের এই ধারণা সত্যতা ও যথার্থতার বাগানে আরাও প্রস্ফুটিত হয়। কেননা অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার পরে কোন বিষয়ের সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে?

উল্লিখিত বিষয়াবলীর প্রেক্ষিতে **বাংলাদেশের মানুষের প্রতি সর্বদাই আমার এক বিশেষ অনুরাগ ও ভালবাসা রয়েছে**। এবং যদিও আমার কর্তব্যাবলী আমার সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন জীবন নির্বাহে বাধ্য করে এবং এটাই ন্যায়নীতি সম্মত সঠিক ব্যাপার, কিন্তু আমার স্বভাবজাত প্রবণতা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী আমি বাংলার মানুষকে অপারগ অনেক দেশের উপর অগ্রগণ্য করি এবং বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা হলে এ দেশ হতে ইসলাম ও আহমদীয়ত অনেক সাহায্য ও সমর্থন লাভ করবে। হিন্দুস্থানের দুটি প্রদেশ সিন্ধুদেশ এবং বাংলাদেশের দিক হতে আমি সেই সুরভি অনুভব করতেছি যা রসূল করীম (সঃ)-এর যুগে ইয়ামনের দিক হতে এসেছিল। এবং আমি আমার এই ধারণা অনুযায়ী আপনাদের চেষ্টা চরিত্র প্রত্যক্ষ করতে চাই। কেননা মানুষ কোন জিনিস সম্পর্কে তার নিজ ধারণা ও আশানুরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।

আমার বিবেচনায় বাংলাদেশ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম প্রচারের জন্য দুনিয়ার উৎকৃষ্টতম ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে একটি। আমি দেখতে পাই যে, আপনাদের দেশের উপর আল্লাহ্তায়ালার এমনই কৃপা যে, আপনাদের দেশের মানুষ অত্যন্ত সরল প্রকৃতির এবং সত্যকে কবুল করার জন্য সম্ভবত আগ্রহী।

ভাইয়েরা আমার! আল্লাহ্তায়ালা আপনাদের উপর অত্যন্ত গুরুদায়িত্বভার ন্যস্ত করেছেন। হেদায়াত কবুল করা এত কঠিন বিষয় নয় যতটুকু উহাকে সংরক্ষণ করা এবং এর কদর করা কঠিন হয়ে থাকে। আপনারা কি দেখেন না যে, চক্ষু, নাসিকা ও জিহ্বা লাভ করার জন্য মানুষকে কোন পরিশ্রম বা চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু দুনিয়াতে এমন অন্ধ অল্প সংখ্যক পাওয়া যাবে, যাদের জন্ম হতে চক্ষু দেয়া হয় না।কিন্তু এরূপ অন্ধ সংখ্যায় অনেক পাওয়া যাবে যারা তাদের চক্ষুর রক্ষণাবেক্ষণ করেনি। এবং তাদের চাইতেও অধিক সংখ্যক এমন অন্ধ ব্যক্তি পাওয়া যাবে, যারা চক্ষুর কদর করে নাই এবং চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তারা অন্ধদিগের শামিল। সুতরাং হে বন্ধুগণ! যখন আল্লাহ্তায়ালা আপনাদিগকে চক্ষু দান করেছেন এবং হেদায়াত গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন, তখন সেই হেদায়াতের সংরক্ষণ করুন এবং উহাকে ব্যর্থতা ও বিনাশের কবল হতে রক্ষা করুন। হে বন্ধুগণ! হেদায়াত খোদাতায়ালার তরফ হতে আসে এবং যদি আমরা নিজেরা আমাদের চক্ষু বুজে না নেই তাহলে উহা গ্রহণ করা মোটেই দুষ্কর নহে।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত নবী করীম (সঃ) এর সময়ে এবং আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মৌঃ নুরুদ্দীন (রাঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময়ে খোলা চোখে হেদায়াত অবলোকন করেন এবং উহা গ্রহণে তাদের এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না। হযরত উমর (রাঃ) যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন করীম শ্রবণে বঞ্চিত ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্তই ইসলামের মোকাবেলা করেছেন, কিন্তু একদিন হঠাৎ কুরআন করীম তাঁর কানে পড়লে তৎক্ষণাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং মুসলমান হওয়া তথা হেদায়াত কবুল করা কোন সাধনাপ্রসূত নহে। ইহাত বিনা কর্মেরই ফলস্বরূপ ঃ কোন কর্ম ফল নহে। যদি আমরা নিজেরা অন্তরলোকের প্রবেশদ্বারসমূহ রুদ্ধ না করি তা হলে হেদায়াত আমরা পেয়ে যাই! যেমন সূর্যের আলো আমরা নিজের গৃহদ্বার রুদ্ধ না করলে আপনি আপনি আমাদের গৃহে প্রবেশ করে। যদ্বারা মোমেন পরস্পর পরিচিত হয়, অথবা কাফেরের মোকাবেলায় মোমেনের পার্থক্য ও বিশেষত্ব বুঝা যায় সেই প্রকৃত কাজ হল লব্ধ হেদায়েতের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান তথা স্বীয় জীবনে উহার যথার্থ প্রয়োগ ও রূপায়ন। এবং এই সেই কাজ যার জন্য আমাদের যথার্থ শক্তি ও সাধনা অবলম্বন করতে হয় এবং যার মধ্য দিয়ে আমাদের সাহস ও বিচক্ষণতা আমাদের অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা এবং

আমাদের নিষ্ঠা ও ভালবাসার পরীক্ষা হয়ে থাকে। যদি এই কাজে আমরা সফলকাম হই, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, একটা কিছু সাধনা করলাম এবং যার জন্য আমরা খোদাতায়ালার নিকট পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হতে পারি। নতুবা সূর্যকে সূর্য বলে দিলে মানুষের পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয় না। সুতরাং হে ভ্রাতাগণ! নিজদিগকে আপনারা সত্যিকার খাঁটি ও পাকা মোমেন এবং আহমদী বানাবার চেষ্টা করুন, যাতে আপনাদের ঈমান আপনাদের জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হয় এবং আপনাদের গৃহকে ইহজগতেই জান্নাতে পরিণত করে। আপনাদের উচিত, নিজ অন্তরকে শৈথিল্য ও আলস্যের প্রকোপ হতে রক্ষা করা এবং কাপুরুষতা ও কপটতার নাগপাশ হতে মুক্ত করা এবং অজ্ঞানতার মৃত্যু হতে বাঁচার প্রয়াস পাওয়া। জ্ঞান সুধা পান করুন এবং ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের ধনভান্ডার একত্র করুন। যে ঐশীতত্ত্বজ্ঞ (আরেফ) নহে, সে বস্তুত এমন এক পঁচা গলা মৃতশব বিশেষ– যে নিজের কোন মঙ্গল সাধন করতে পারে না এবং অন্যদেরও স্বাস্থ্য বিকারের কারণ হতে পারে।

হে ভ্রাতাগণ! আপনাদের উচিত আপনাদের রসনাকে মিথ্যা ভাষণ, দোষারূপ, কুসমালোচনা, ছিদ্রান্বেষন, কুবাক্য পরনিন্দা ও ঘৃণাবাচক কটুক্তি এবং অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ হতে পবিত্র করা। বরং সভ্য ভাষণের স্বভাব অর্জন করুন ও মানুষের দোষ গণনার চাইতে সদগুণ বলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করুন এবং ঘৃণার পরিবর্তে সসম্মানে আপন ভ্রাতাদের নাম উচ্চারণ করুন, বরং যারা আপনাদের শত্রু তাদের নামও। কেননা প্রীতি ও ভালবাসার তরবারী যা কর্তন করতে পারে, তা শত্রুতা করতে পারে না। তোমরা শত্রুতাকে শত্রুতার দ্বারা নহে, বরং প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা বিদূরিত করতে সক্ষম হবে।

ইহাও উচিত যে, আপনারা যেন মানুষের সহিত আপনাদের লেন-দেনের ব্যাপার সঠিকভাবে হিসাব রাখেন। আপনাদের সকল ব্যবহার ও আচরণ সুষ্ঠু ও সুমধুর করুন। আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ যেন আপনাদের চারিত্রিক বিশেষত্ব হয়, দীন-দরিদ্রের সাহায্য করা, অনাথ ও বিধবাদিগের খোঁজখবর-রাখ- এবং রোগীদিগের সেবা সুশ্রুষা করা যেন আপনাদের জীবন ধারায় পরিণত হয় এবং আপনাদের আচার ব্যবহার যেন এত মার্জিত ও ত্রুটিহীন হয় যে, শত্রুও যেন স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আহমদীয়াত মানুষের আমুল পরিবর্তন সাধন করে থাকে-উহা পশুবৎ ব্যক্তিকে গ্রহণ করে সত্যিকার মানুষে রূপান্তরিত করে।

ইহা হল ঈমানের হেফাযত বা সংরক্ষণের বিষয় যার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দ্বিতীয় বিষয় হল, ঈমানের কদর করা বা মর্যাদা দেয়া, ইহাও প্রথমটির চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। আল্লাহ্তায়ালা কুরআন করীমে বলেন-

অর্থাৎ "খোদাতায়ালার তরফ হতে তোমরা যে নেয়ামত প্রাপ্ত হও, উহাকে প্রকাশ কর তথা উহার সম্প্রসারণ কর।" তেমনিভাবে তিনি আরো বলেন- যদি তোমরা আমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা পোষণ কর তাহলে আমি তোমাদের উপর আরও নেয়ামত বর্ষণ করব, কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তা হলে আমরা শুধু সেই নিয়ামতই তোমাদের নিকট হতে ছিনিয়ে নেব না, বরং তোমাদের উপর আযাবও প্রেরণ করব।" খোদা প্রদত্ত হেদায়েত বস্তুত নেয়ামতসমূহের অন্যতম। সুতরাং উহার আবেদন এই যে, আমরা যেন সেই হেদায়াতকে অন্যান্যদিগের নিকট পৌছাই।

আপনারা অবশ্য আহমদীয়তের তবলীগ বা প্রচারের চেষ্টা করে থাকেন এবং মানুষের নিকট আল্লাহ্তায়ালার পয়গাম পৌছে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন হল যে, আপনারা কি এ কাজ যে পর্যায়ে বা পরিমাণে সম্পাদন করিতেছেন, যাহাকে খোদাতায়ালার নেয়ামতের কদর বলে অবিহিত করা যেতে পারে? এবং আপনাদের এই চেষ্টা ও পরিশ্রম কি আপনাদের দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত? যদি এর জওয়াব না সুচক হয়, তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, আপনারা আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামতের যথোপযুক্ত কদর করেন নাই।

প্রিয় বন্ধুগণ! আজ পনর বৎসর হতেও অধিককাল অতিবাহিত হল, যে বাংলাদেশে আহমদী জামাত কায়েম হয়েছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত ছয় কোটি মানুষের অধ্যুষিত দেশে এখন পর্যন্ত আহমদীদিগের সংখ্যা হচ্ছে সর্বমোট মাত্র দুই তিন হাজার। তদুপরী ইহা হতে অধিকতর আশ্চর্যজনক বিষয় হল এই যে, এই সল্প সংখ্যক আহমদীও কয়েকটি স্থানের মধ্যেই সীমিত। শত শত মাইলব্যাপী অঞ্চল সম্পূর্ণ আহমদীয়ত শূন্য। তথায় এখন পর্যন্ত বীজও বপিত হয়নি, যার সম্বন্ধে আশা করা যেত যে, উহা অনুকূল আবহাওয়ায় অঙ্কুরিত ও পরিবর্ধিত হবে। যখন বাংলাদেশের এহেন অবস্থা, তখন আপনারা কিভাবে আশ্বস্ত হতে পারেন যে, আপনারা আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন? যখন একদিকে সুস্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে; হৃদয়গুলি হেদায়াত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আর অন্যদিকে আহমদীয়াতের উন্নতির গতিধারা সম্পূর্ণ মন্থর ও নিস্তেজ, বরং না থাকার নামান্তর, তখন ইহা স্বীকার করতেই হবে যে, চেষ্টায় ত্রুটি আছে এবং তা অত্যন্ত প্রকট। এর অপনোদন যথাশীঘ্র অত্যাবশ্যক।

সুতরাং এ অবস্থাবলীর প্রেক্ষিতে আমি আপনাদিগকে এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, বাংলাদেশের জিলাগুলির দিকে সমষ্টিগতভাবে নজর দিন এবং যে অঞ্চলগুলিতে আহমদীয়ত বিস্তার লাভ করে নাই, সেগুলিকে ধরুন এবং সেসব স্থানে তবলীগের জন্য প্রচেষ্টা চালনা করুন। আপনারা সংখ্যায় স্বল্প। আর্থিক অবস্থাও ক্ষীণ। কিন্তু প্রত্যেক 'খোদাই জামাত' প্রারম্ভে এরূপই অল্পসংখ্যক ও দুর্বল রয়েছে। বরং ইহা অপেক্ষাও দুর্বল। সুতরাং দুর্বলতার প্রতি তাকাইও না। আর নিজেদের সংখ্যা সল্পতার জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হইও না। এখলাস ও ঈমান, নিষ্ঠা ও প্রত্যয় এবং পূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কুরবানি, আত্মোৎসর্গ এবং সাধনা করার অভ্যাস করুন। তা সংখ্যা-স্বল্পতা এবং অর্থ ও উপকরণগত দুর্বলতা উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতার কারণ হবে না, বরং কৃতকার্যতা ও বিজয় তোমাদের সহযাত্রী হইবে এবং স্বল্প দিনের মধ্যে তোমরা তোমাদের দেশের নকশা পরিবর্তিত আকারে দেখতে পাবে।'

যদি আপনারা আপনাদের দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজের দিকে এবং জামাতের অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংশোধন এবং জ্ঞানগত উন্নতি সাধনের দিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, তা হলে আমিও আপনাদের নিকট ওয়াদা করতেছি যে, আমিও আপনাদের চেষ্টা প্রচেষ্টার সফলতা ও ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য দোয়া করব এবং ইনশাল্লাহ্ ক্রমাগতভাবে করতে থাকব।

আল্লাহ্তায়ালা আপনাদিগকে তাঁর সন্তুষ্টির পথসমূহে চলবার তৌফিক দান করুন এবং আপনাদিগকে সাহস ও উদ্যম এবং শক্তি ও সামর্থ্য প্রদান করুন, যেন সত্যকে সারা বিশ্বে ছড়াতে পারেন। সঠিক পথ ও ধারা তিনি আপনাদিগকে প্রদর্শন করুন এবং আপনাদের কথা ও কলমে এবং মন ও মস্তিষ্কে আশীষ ও বরকত দিন। আল্লাহুম্মা আমীন।

মীর্যা মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্, সানী
২৭ মার্চ, ১৯২৭ইং
অনুবাদ - **আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্
সংকলন - **মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল**

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)—এর স্মরণে

মূল ঃ মরহুম সাহেবযাদা মির্যা মোযাফ্ফর আহমদ সাহেব আমীর- জামাতে আহমদীয়া, আমেরিকা।

এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ আমার দেখা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরী। সৌভাগ্যবশত আমার ছোটবেলা থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত হযরত মুসলেহ মাওউদকে (রাঃ) খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়। আমার সবচেয়ে প্রথম স্মৃতি যা আমাকে সেই যুগে নিয়ে যায় যখন আমি হুযূরকে (রাঃ) আম্মাজানের বারান্দা দিয়ে নামায পড়ার জন্য যেতে দেখতাম। নামায থেকে ফেরার পথে বেশ কিছু সময় বিশেষত মাগরিবের নামাযের পরে আম্মাজানের সান্নিধ্যে কাটাতেন। যে সকল আত্মীয় ওখানে উপস্থিত থাকতেন তাদের সাথেও কথাবার্তা বলতেন। কোন কোন সময়ে বিশেষভাবে শীতের সময়ে তিনি প্রথমে বাইতুদদোয়াতে সুন্নত আদায় করতেন। পরে তিনি বারান্দায় কিম্বা যদি আবহাওয়া বেশি শুষ্ক হতে তবে হযরত আম্মাজানের কামরাতে হাঁটতেন। অনেক সময় আব্বাজানের কামরাতেও হাঁটতেন। এ সময় হযরত আব্বাজান অথবা মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের (যিনি তাঁর বোন হযরত আম্মাজানের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন) সাথে জামাতের বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করতেন। তিনি শিশুদের সাথেও কথাবার্তা বলতেন। আমার মনে আছে একবার তিনি বলেন, কুরআন মজীদ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমুদ্র। শিশুরা তোমাদের ইহা পড়া এবং এর উপর মনোযোগী হওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত– যেন তোমরা এ থেকে প্রজ্ঞার মণি মানিক্য বের করতে পার। যদিও তোমরা এখন বালক বয়সে পৌঁছাওনি। তবুও কমপক্ষে শেওলা বের করার যোগ্যতা সৃষ্টি কর।

কুরআন মজীদের প্রতি ভালবাসা ঃ কুরআন মজীদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধন ছিল গভীর ও চিরন্তন। রোববার তিনি মেয়েদের মাঝে দরস দিতেন। এ দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে যে, তিনি (রাঃ) আম্মাজানের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন আর মহিলারা সামনের সিঁড়ি, বারান্দা ও সংযুক্ত কামরায় বসে আছেন। এ সময় কম শ্রোতা হত। তিনি পুরুষদের মাঝেও কুরআনের দরস দেন, যাতে কেবলমাত্র কাদিয়ান থেকে নয়–বাইরের বন্ধুরাও অংশ নেন। এ দরস কয়েক সপ্তাহ জারী থাকে। প্রতিদিন কয়েক ঘন্টাব্যাপী হয়। গত রমযানের সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (আইঃ) হযরত মুসলেহ মাওউদের (রাঃ) এ ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করেন যাতে তিনি বলেন এমন দিন আসবে যে খলীফা ওয়াক্তের কুরআন মজীদের দরস একই সময়ে সারা দুনিয়াতে প্রচার হবে। হুযূরের (রাঃ) এ ইচ্ছা দুনিয়া পুরো হতে দেখছে। যখন আমার মুসলেহ্ মাওউদের (রাঃ) মেয়ের সাথে বিয়ে হয় তখন আমরা গরমের ছুটিতে তাঁর (রাঃ) সাথে ধরমশালাতে কাটাই। হুযূর (রাঃ) নিজে প্রস্তাব করেন যে, তিনি (রাঃ) কুরআন মজীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সভায় দরস দিবেন। আমি এই প্রাইভেট দরসের নোট দিলাম। তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীর যা কয়েক খন্ডে সমাপ্ত, যা তাঁর (রাঃ) কুরআন মজীদের প্রতি অসীম ভালবাসার মিনার। যাতে কুরআনের তুলনাহীন জ্ঞান ও অনন্ত পয়গামকে অত্যন্ত সুন্দর ও সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে। এ তফসীরের অনেক অংশ ঐ সময় লেখা হয় যখন তাঁর শরীর দুর্বল ছিল। আমার ঐ দিনও ভালভাবে মনে আছে যখন হুযূর জাবা নামক স্থানে মাঠে প্রচন্ড গরম থেকে বাঁচার জন্য চলে যেতেন এবং এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা তফসীর লেখায় কাটাতেন।

দোয়ার শক্তির উপর পূর্ণ একীন ঃ তাঁর কীর্তির আরও এক সুন্দর দিক হলো দোয়ার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা। যখন জামাতের উপর কোন বিপদ আসতো, তিনি বাইতুদ্দোয়াতে ঘন্টার পর ঘন্টা দোয়াতে মগ্ন থাকতেন। আমি হিযরতের সময় কয়েক বার দেখেছি যখন তিনি বায়তুদদোয়া থেকে বাইরে আসতেন তাঁর চোখ লাল ও চোখ দিয়ে পানি ঝরার চিহ্ন থাকতো। এ সময় আমি পাকিস্তানের পক্ষে এডিশনার ডেপুটি কমিশনার পদে অমৃতসরে ছিলাম। ভারত সরকারের পক্ষে একজন শিখ বন্ধু এই পদে ছিলেন। ডেপুটি কমিশনার পদে একজন ইংরেজ ছিলেন। তাকে এই নির্দেশ দেয়া হয় যে, অমৃতসরের ব্যাপারে যে ফয়সালা হবে অর্থাৎ হিন্দুস্থান কিম্বা পাকিস্তান হবে সেরূপে তিনি সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনারকে চার্জ দেবেন। একদিন ডেপুটি কমিশনার লাহোর থেকে এসে আমাকে গোপনে বলেন যে, মনে হয় গুরুদাসপুর জেলা ভারতকে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে আমি খুবই উদ্বিগ্ন হই। যে ফর্মূলাতে ভাগের সিদ্ধান্ত হয় সে অনুসারে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা যা অন্য মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার সাথে সংযুক্ত তা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হবে। এ পদ্ধতি অনুসারে সব দিক থেকে এটি পাকিস্তানের অংশে যাওয়া উচিত। আমার এ যুক্তিতে ক্লান্ত হয়ে তিনি বলেন, লাহোর আজকাল গুজবের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। লোকজন তো গুজবে বিশ্বাস করতে পারছে না। তিনি আমাকে পরামর্শ দেন যে কাদিয়ানে চলে যাও। কারণ সি. আই. ডি.-র রিপোর্ট হল তোমার বাসাতে বোমা ফেলার পরিকল্পনা আছে। অমৃতসর পাকিস্তানের অংশে পড়লে তোমাকে কাদিয়ান থেকে ডেকে নেব। তখন আমি কাদিয়ানে রওয়ানা হই। কাসরে খেলাফতে গিয়ে হুযূরের খেদমতে ও সংবাদ জানাই। তখন হুযূর বলেন কিছু সময় পূর্বে এ সম্পর্কে ইলহাম হয়েছে।

অন্য আর এক ঘটনা যা আমার মন ও মস্তিষ্কে গভীরভাবে আছে। মনে হয় যেন কালকের ঘটনা। আমি রাতে নিজের ঘরের বাইরের পুরুষদের অংশের বারান্দায় শুয়েছিলাম। গরমের সময় ছিল। মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক ও কষ্টের শব্দে আমার চোখ খুলে গেল। আমি ভয় পেলাম। যখন চোখ থেকে ঘুম সম্পূর্ণ চলে গেল তখন বুঝতে পারলাম হযরত মুসলেহ মাওউদের (রাঃ) তাহাজ্জুদ নামাযের শব্দ। যা তিনি হযরত উম্মে নাসেরের ঘরের উপরের বারান্দায় আদায় করছিলেন। যার দেওয়াল আমাদের ঘরের সংলগ্ন। বিগলিত দোয়ার শব্দ। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করি। তিনি বার বার "**এহদিনাস্ সিরাতায়াল মুস্তাকিম**" এত বিনীত হৃদয়ে পড়েছিলেন যেন কখনও শেষ হবে না। এ রাতের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না।

জামাতের সাথে গভীর ভালবাসা ঃ জামাতের সাথে তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল। আমার ভালভাবে মনে আছে যখন কাদিয়ান থেকে

কোন কাফেলা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতো, তখন তিনি ছোট কুরআন শরীফ নিয়ে বারান্দায় পায়চারী করতে থাকতেন এবং তেলাওয়াত করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাফেলার সীমান্ত পারাপারের খবর না পৌছাত ততক্ষণ তিনি সর্বদা দোয়া করতেন। এ কথা আমি জানি যে যখন জামাত কোন বিপদের মধ্য দিয়ে যেত, তিনি বিছানায় শোয়া ছেড়ে দিয়ে ফরাজের ওপর শুতেন। এমনও হয়েছে যে আল্লাহ্তায়ালার কাছে থেকেও পরীক্ষার মেঘ কেটে যাওয়ার ঈঙ্গিত পাওয়া যেত যে, যাও বিছানায় আরাম কর।

আর এক ঘটনা যা আমার ওপর খুব প্রভাব ফেলেছে তা হল, আমার বিয়ের কিছুদিন পর যখন আমি মুলতানে এসিসটেন্ট কমিশনার হিসাবে চাকুরীতে ছিলাম তখন আমার স্ত্রীর মামা কর্ণেল সৈয়দ হাবিবুল্লাহ্ খান সাহেবের ওখানে আমরা অস্থায়ীভাবে থাকতাম। তিনি সেখানে সুপারিনটেনডেন্ট জেল ছিলেন। হুযূর (রাঃ) সিন্ধে যাওয়ার সময় ওখানে একদিন থাকেন। তিনি আমাকে বসার ঘরে নিয়ে যান এবং তাঁর সাথে বসার ইঙ্গিত করেন এবং বলেন তুমি আই. সি. এস. অফিসার। তোমার উচ্চস্তরে মেলামেশার অনেক সুযোগ হবে কিন্তু এ ঘটনা কখনই যেন গরীব ও দুর্বলদের সব রকম সাহায্য করা থেকে তোমাকে বিমুখ না করে। তিনি আমাদের আসবাবপত্রের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন "এ সব আসবাব পত্র গরীবদের সাথে মেলামেশায় বাধা সৃষ্টি করার যোগ্য নয়। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর দরজা যেমন গরীবদের জন্য সর্বদা খোলা থাকতো, সেই সুন্নত পালন করা উচিত। তার আওয়াজ ভরাট ছিল এবং অশ্রু ছল ছল করছিল। তাঁর এ অবস্থার কল্পনা করা যায় কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। আমি তাঁকে কখনো এতো আবেগময় দেখিনি।

আরও একটি বিষয় আমার ওপর খুব প্রভাব ফেলে। যা হল জামাতের সেবার উৎসাহ। আমি এখনো তাঁকে দেখি ফরাসের ওপর বসে আছেন। চকলেট রংয়ের কয়েক ডজন মোমবাতি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। যেগুলো একটা বাক্সের উপর জ্বালানো রয়েছে। জেলে পড়াশুনায় ও লেখার সময় এরূপ বাতি দেখা যায়। তাঁর গলা খুব সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন হওয়ার কারণে মেটে তেলের ধোঁয়াতে তা আক্রান্ত হত। সে সময় কাদিয়ানে বিদ্যুৎ আসেনি। মোমবাতির ব্যবহার হত। কাদিয়ানে বিদ্যুৎ আসে ১৯৩০ সালে। এর আগে কাজের চাপ বেশি ও বিভিন্ন ধরনের হত। আমি অনেকবার দেখেছি জামাত যখন কোন কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যেত, তিনি সারা রাত এক মিনিট বিশ্রাম না নিয়ে কাজ করতেন। অনেক সময় কাজ করতে করতে উঠে সকালের নামাযে আসতেন। তিনি কখনো কখনো পান্ডুলিপি ও চিঠি পত্রের তরজমা করার জন্য কিম্বা সেসব বিষয়ের ওপর মতামত জানার জন্য পাঠাতেন। আমরা সেসব এদিক ওদিক নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করতাম।

হযরত আম্মাজানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঃ হযরত আম্মাজানের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁর ভ্রমণের বেশির ভাগ সময়ে তিনি আম্মাজানকে সাথে নিতেন। হযরত আম্মাজান ভালবেসে তাঁকে মিঁয়া বলে সম্বোধন করতেন। যদি কোন সফরের সময় হুযূর দেরী করতেন তাহলে হযরত আম্মাজান খুব ভয় পেতেন ও অস্থির হয়ে যেতেন। আমার স্ত্রী বর্ণনা করে। "একবার খুবই অস্থির হয়ে হযরত আম্মাজান হুযূরের (রাঃ) কোন সফর থেকে ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন। যখন তিনি এলেন, আম্মাজান বলেন, "আমি তোমাকে বারণ করি নাই, যে মাগরিবের পরে দেরী না করার জন্য।" হযরত সাহেব বলেন, "জ্বী আম্মাজান।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন "আবার করবে" হুযূর বলেন, না আম্মাজান।" হযরত আম্মাজান হুযূরের শরীরে একটি নরম ছড়ি দ্বারা মারার ঢংয়ে ও ছুঁয়ে বললেন "আর কখনো করো না। তোমার জানা নেই যে আমার হৃদয়ে শংকা থাকে।" এ হলো এক দিক যার স্বভাবজাত আবেগ। যার প্রকাশ আম্মাজান করতেন। কিন্তু অন্য আহমদীদের মত তিনিও হুযূর (রাঃ)-কে খুবই সম্মান করতেন।

যখন হযরত আম্মাজানের রাবওয়াতে মৃত্যু হয় তখন হুযূর (রাঃ) ইচ্ছা ছিল তাঁকে তাঁর স্বামী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পাশে দাফন করার। এ সময় আমি লাহোরে কর্মরত ছিলাম। হুযূরের (রাঃ) আদেশ হয় যে, এ সম্পর্কে ইন্ডিয়ান হাই কমিশনারের সাথে যোগাযোগ করা হোক। আমার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে হাই কমিশন দিল্লীর সাথে যোগাযোগ করে এবং জানায় যে ভারত সরকার এটিকে বিশেষ হিসাবে অনুমতি দিয়েছে। তবে এ শর্ত দেয়া হয় যে এ জন্য বিশ জনের বেশি আত্মীয় ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যেতে পারবেন না। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এই উদ্যোগকে এ জন্য নাকচ করে দেন যে, হযরত আম্মাজানের মর্যাদা অনুসারে কমপক্ষে দু'হাজার আহমদীর মাইয়েতের সাথে যাওয়া প্রয়োজন।

এক মহান বক্তা ঃ হুযূর (রাঃ) খুব বড় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আমি দুনিয়াতে অনেক সফর করেছি। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নেতাদের বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু আমি কাউকে বক্তা হিসাবে তাঁর সমকক্ষ পাইনি। তাঁর (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি তাঁর বক্তৃতা দ্বারা পাহাড়কে টলাতে পারতেন। এর সত্যতা সম্পর্কে জামাতের হাজার নয় লাখো লোক সাক্ষী আছে। তিনি শ্রোতাদের রাজকীয়ভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। হিজরতের পরপরই তিনি বিভিন্ন শহরে পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের ওপর বক্তব্য রাখেন। ইসলামিয়া কলেজের এক প্রফেসর যিনি আমার এক বন্ধুর সাথে বসে ছিলেন। তিনি অকৃত্রিমভাবে বলে উঠেন **হুযূরের (রাঃ) তো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত।** এর আগে "ইসলামে মতভেদের সূত্রপাত" শীর্ষক বক্তৃতার সময় ইসলামিয়া কলেজের ইতিহাসের প্রফেসর তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, "আমি নিজেকে ইসলামের ইতিহাসের ওপর বেশি জ্ঞান রাখি বলে গর্ববোধ করতাম কিন্তু তাঁর (রাঃ) বক্তব্য শোনার পর আমার মনে হচ্ছে আমি সামান্য একজন স্কুলের ছাত্র।

যে সব বন্ধুরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (রাঃ) এর মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পড়েছেন তাদের জন্য এ কথা কোন বিস্ময়ের বিষয় নয়। আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর জন্মের পূর্বে এই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা ইতিহাসের পাতার মত। তা কিরূপ শান শওকতের সাথে পূর্ণ হয়েছে তা যে কেউ দেখতে পারে।

তাঁর বন্ধুত্ব ঃ আমার সারা জীবন হুযূরের (রাঃ) বন্ধুত্বের ছায়ায় কেটেছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপে অবস্থানকালে হুযূরের (রাঃ) চিঠিতে অনেক মূল্যবান উপদেশ থাকতো। এর মধ্যে একটা যা আমার উপর খুব প্রভাব ফেলে এতে তিনি কুরআন মজীদের আয়াত উল্লেখ করেন (বঙ্গানুবাদ) **"সকল সম্মানের কেন্দ্র বিন্দু**

আল্লাহ্‌তায়ালা ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর আমি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করি। আমার বিয়ে হুযূরের সাহেবযাদীর সাথে হয়। হুযূর (রাঃ) আমার বিবিকে উপদেশ দেন যে মোজাফ্‌ফর তো সরকারী চাকুরে। কিন্তু তুমি নও, গরীব ও মিসকিনদের সাথে সাক্ষাৎ কর। কিন্তু পার্থিব সম্মানের জন্য কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে যেও না। শীঘ্রই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ফাইন্যান্সিয়াল কমিশনার সাহেব নিজের বেগমের সাথে সারগোদা পরিদর্শনে আসেন। সকল অফিসারদের বেগমরা ফাইন্যান্সিয়াল কমিশনারের বেগমের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর অবস্থান স্থলে হাজিরা দিলেন। তাদের তাগিদ সত্ত্বেও আমার স্ত্রী যেতে অস্বীকার করে। পরে ফাইন্যান্সিল কমিশনারের বেগম সাহেবা ডেপুটি কমিশনারের বেগমকেও ছেড়ে বিশেষভাবে আমার বেগমকে আলাদা চায়ের দাওয়াত দেন। ভালভাবে পর্দার ব্যবস্থা করেন। সারগোদার অফিসার এলাকায় সকলে আশ্চর্য হয়। বার বার প্রশ্ন করা হয় যে আমার স্ত্রীর সাথে কমিশনার সাহেবের বেগমের পূর্ব পরিচয় ছিল কিনা। আমার স্ত্রী তাদের বলেন যে, "না এরূপ কোন ঘটনা নাই। তাঁর তো আমার সাথে প্রথম দেখা।"

অত্যন্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও হুযূর (রাঃ) শিশু ও আত্মীয়দের জন্য কিছু সময় অবশ্যই বের করতেন। মনে আছে হুযূর (রাঃ) শীতের সময় এশার নামাযের পর খান্দানের ছেলেদের একত্রিত করে গল্প শোনাতেন। এ সব গল্প কোন বইয়ের ছিল না। তিনি নিজেই গল্পের কাঠামো তৈরী করে তা বাড়াতেন। এ সব গল্পে উপদেশ থাকতো। যখন এ ধারা শেষ হত তখন অনেক সময় ছোট বাচ্চারা যারা গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তো, তাদের কাজের লোকেরা উঠিয়ে ঘরে ঘরে রেখে আসতো।

অবকাশের সময় ঃ হুযূরের শিকারের নেশা ছিল। ঘরের লোকজন ও বন্ধু বান্ধবদের সাথে খানা পাকানোর প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। একবার তিনি জামাতের অনেক সদস্যদের সাথে নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত সাঁতারের প্রতিযোগিতায় শরীক হন। শর্ত এই ছিল যে যার পা মাটিতে লাগবে তিনি হাত উঁচু করে প্রতিযোগিতা থেকে বার হয়ে যাবেন। যখন শর্ত মোতাবেক তিনি অপর তীরে পৌছান তাঁর সাথে তখন কিছু বন্ধু অবশিষ্ট ছিলেন। এ সময় তিনি লম্বা পোষাক পরতেন যা তাঁর হাঁটু পর্যন্ত পড়তো।

একজন মহান পরিচালক ঃ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) খুব নিপুণ দূরদর্শী ও যোগ্য কার্য নির্বাহী ছিলেন। জামাতের বর্তমান যে অবস্থা এবং প্রশাসনিক কাঠামো তা তাঁরই জারী করা ইরশাদের ফল। সূরার নেযাম কায়েম, সিন্ধু প্রদেশে জামাতের জন্য একটি বড় জমিদারীর ব্যবস্থা করা যা হুযূর (রাঃ) স্বপ্ন অনুসারে ক্রয় করেন। তাহরিকে জাদীদের স্কীমের দ্বারা বিদেশে তবলীগ এবং আহরার আন্দোলনের সামনে বাঁধ বেঁধে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু পরিকল্পনা যা তাঁর দূরদর্শিতা ও নিপুণ নেতৃত্বের পরিচায়ক।

জামাতের সদস্যদের সাহায্য করা এবং পরিশ্রমের মর্যাদা স্থাপনের জন্য তিনি নিয়মিত ওয়াকারে আমল কার্যক্রম করার উপদেশ দেন। যাতে সকল সদস্য পদ ও মর্যাদা নির্বিশেষে নিজেদের শহরে ঘোড়া পার করা, রাস্তা মেরামত ও মহল্লা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করায় অংশ নিতেন। হুযূর (রাঃ) মাটি ভরা ঝুড়ি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এ দৃশ্য আমার ভালভাবে মনে আছে। তাঁর নিজের উদাহরণ জামাতের সকল সদস্যদের কাছে অনুসরণীয় ও আদর্শ হতো।

একজন সাহসী ব্যক্তি ঃ হুযূর (রাঃ) খুব সাহসী ও ধৈর্যশীল ছিলেন। আমার স্মরণ আছে যখন তিনি নামাযের সময় আক্রান্ত হন। তখন ডি. আই.জি. এ খবর প্রচার হওয়ার পূর্বেই আমাকে জানান এবং এ-ও বলেন যে, তাঁর অবস্থা আশঙ্কামুক্ত। কিন্তু রাবওয়ার সাথে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। পুলিশকে যে কোন অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য সতর্ক রাখা হয়। আমি তৎক্ষণাৎ দক্ষ সার্জন আমীর উদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করি। কিন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন।

এজন্য অন্য বিশেষজ্ঞ সার্জন ডাক্তার রিয়াজ কাদীরকে নিয়ে আমি রাতে লাহোর থেকে রাবওয়া পৌছাই। ডাক্তার সাহেবযাদা মির্যা মনওয়ার আহমদ সাহেব প্রাথমিক ড্রেস ও ব্যান্ডেজ করে দেন। কিন্তু ডাক্তার দেখেন যে, হুযূরের দেহের আক্রান্ত এলাকা ফুলে আছে। তিনি সিদ্ধান্তে পৌছান যে, কোন শিরা কেটে গেছে। যার জন্য রক্ত জমা হয়ে আছে। সেজন্য সাথে সাথে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার জন্য বেহুঁস করা প্রয়োজন। কিন্তু হুযূর অস্বীকার করেন। তিনি বেহুঁস হওয়ার ঔষধ গ্রহণ করলেন না। তিনি হুঁস থাকা অবস্থায় অপারেশন করতে বলেন। অপারেশনের সময় হুযূর (রাঃ) চরম ধৈর্য্যের ও সহ্যের পরিচয় দেন। এ জখমের জন্য তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর বড় প্রভাব পড়ে। দীর্ঘ সময় অসুস্থ থাকার পর তিনি আরোগ্য লাভ করেন। আমরা সকলে রাবওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর এ দীর্ঘ অসুস্থতাও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল। কারণ এর ফলে জামাতের সদস্যদের সহ্য করার হিম্মত সৃষ্টি হয়। অন্যথায় তাঁর জামাতের সাথে যে ভালবাসা ও সম্পর্ক ছিল তাতে সম্ভবত এ অবস্থায় জামাত বেহাল হয়ে পড়তো।

হুযূর (রাঃ) সারা জীবন মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। যা বাস্তব এবং ইতিহাসের অংশ। শুদ্ধি আন্দোলন থেকে নিয়ে কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত এবং হিযরতের পূর্বে হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করা। যখনই কোন হিন্দু রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর মর্যাদার বিরুদ্ধে কোন প্রবন্ধ লিখেছে, তিনি সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে খুব দৃঢ় ও সাহসী আওয়াজ তোলেন এবং চেষ্টা করেন যাতে প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে সিরাতুন্নবী (সঃ) দিবস এবং সর্বধর্ম প্রবর্তক দিবস সুন্দর ও জমকালোভাবে পালন অন্যতম। যদি বিধর্মীদের সামনে সাইয়্যেদেনা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করা হয় তবে কোন লোক না জানার কারণে এমন কোন কথা বলবে না যাতে অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয়। আবার সকল ধর্মের প্রবর্তকের সম্মান প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের চরিত্রের উপর বক্তৃতা হলে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে মিলন ও ভাই ভাই সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে তিনি একজন মহান ও অনন্য নেতা ছিলেন। যত গুণ একজন মানুষের মধ্যে থাকতে পারে তা তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর অস্তিত্ব এ সকল গুণ ও সৌন্দর্যের জীবন্ত প্রতীক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর চল্লিশ দিন চিল্লাকাশীর ফলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এ ভবিষ্যদ্বানীর প্রভাবে মানুষের কম্পন শুরু হয় এবং এই একটি ভবিষ্যদ্বাণী অবিশ্বাসীকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অনুবাদ - কওসার আলী মোল্লা

সহশিক্ষা প্রসঙ্গে

[সহশিক্ষা সম্বন্ধে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত মজলিসে মোশাবেরাতের ফয়সালা ও খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) এর নির্দেশ বিভিন্ন সময়ে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা হতে ইতিপূর্বে প্রকাশিত সার্কুলারের উদ্ধৃতি বন্ধুগণের অবগতি ও পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্যে নিম্নে দেয়া হল।]

২১-১-৬৭ইং তারিখে প্রকাশিত সার্কুলার

সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) ১৯৪০ সনে মজলিসে মোশাবেরাতে সহশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত মোশাবেরাতে সাব কমিটির ফয়সালার উপর ভিত্তি করে সাধারণের রায়ের জন্য পেশ করা হলে জামাতের অধিকাংশ সদস্য এর বিরুদ্ধে রায় দেন। হুযূরের এরশাদ, আমি সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত দিতেছি যে, **সহশিক্ষা কোন মতেই সঠিক বলে বিবেচিত হতে পারে না**। নেযারতে তালিম ও তরবিয়ত বিভাগ যেন সহশিক্ষা প্রতিরোধের জন্য জামাতের মধ্যে বিশেষভাবে ঘোষণা করে দেন যেন প্রত্যেক আহমদী জানতে পারেন যে, মরকয এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। এরপরেও যারা এ অপরাধের বশবর্তী হবেন তাদের নিকট হতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হউক এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা হউক। **যদি এ সমস্ত ব্যবস্থাবলীর পরও তারা নিজদিগকে সংশোধন না করেন তা হলে তাদিগকে শাস্তি দেয়া হউক এবং এ শাস্তি জামাত হতে বহিষ্কার করা পর্যন্ত হতে পারে।**" - রিপোর্ট মজলিসে মোশাবেরাত-১৯৪৩

১৯৬৭ সনে মজলিসে মোশাবেরাতে পুনরায় সহশিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, বিধান আপনাদের সম্মুখে রাখা হয়েছে। একে কার্যকর করার প্রয়োজন। সাধারণ রায় সুমরী মজলিস নং ১-২০-৫-৬৭।

আপনার অবগতির জন্য সহশিক্ষা সম্বন্ধে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এর সিদ্ধান্ত এবং খলীফা সালেস (আইঃ) এর মতামত উদ্ধৃতি করা গেল। এখানে আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে, আপনার জামাতে সহশিক্ষার ব্যাপারে আপনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান তা এ মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে জানিয়ে সুখী করবেন। ওয়াস্সালাম।

২৮-১১-৬৭ইং তারিখে প্রকাশিত সার্কুলার

জনাব প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেব,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনি অবহিত রয়েছেন যে কেন্দ্রের গত মজলিসে শুরায় আহমদী মেয়েদের সহশিক্ষা (ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে শিক্ষা) নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) সদরের মজলিসে শুরায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।

আহমদী মেয়েদের সহশিক্ষা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি নতুন নহে। হযরত খলীফায়ে মসীহ্ সানী (রাঃ) মেয়েদের সহশিক্ষা না দেয়ার জন্য জামাতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। গত মজলিসে শুরায় হুযূরের নির্দেশকে নতুনভাবে জামাতের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে মাত্র।

বর্তমান দুনিয়া ইসলামের সকল শিক্ষা বর্জন করে বস্তুবাদিতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হাইস্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সহশিক্ষার নামে জঘন্য জঘন্য কাজ-কারবার চলছে। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেসব কেলেঙ্কারী হচ্ছে তা বর্ণনার অযোগ্য। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আহমদীয়ত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কায়েম হয়েছে। জামাত চলতি দুনিয়ার পরিস্থিতি সহশিক্ষার কুফল পুংখানুপংখভাবে বিবেচনা করে আহমদী মেয়েদের জন্য প্রাইমারী শিক্ষার পরে হাই স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সহশিক্ষা নিষিদ্ধ করেছেন। **তবে মেয়েদের পৃথক প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা যেকোন পর্যায়ে শিক্ষা লাভ করতে পারবে।**

অতএব, আপনি এ সার্কুলার পাওয়া মাত্র আপনার জামাতকে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবেন এবং **যে সকল আহমদী মেয়ে সহশিক্ষায় রয়েছে তাদের অভিভাবকদের অবিলম্বে তাদেরকে সহশিক্ষা হতে সরিয়ে আনার জন্য অনুরোধ করবেন।** যারা জামাতের এ সিদ্ধান্ত পুংখানুপুংখভাবে পালনে অস্বীকার করবে অবিলম্বে তাদের সম্পর্কে প্রাদেশিক আঞ্জুমানে রিপোর্ট দান করবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জামাতের এই নির্দেশ অমান্যকারীদের জন্য জামাত হতে বহিষ্কারের ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে তা একটি চূড়ান্ত ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে কেবল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সকলকে ইসলামের খাঁটি শিক্ষা অনুসরণের তৌফিক দান করুন। আমীন।

(তৎকালীন পাক্ষিক আহমদী থেকে)

ধর্মের দৃষ্টিতে কর্ম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "কর্মের উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা মনযোগ দেয়া আবশ্যক, উপায়গুলির প্রতিও ততটা দেয়া উচিত।" আমরা শুধু কাজের যথার্থতা অনুধাবন করেই ক্ষান্ত হই অথচ একটিবার যদি ঐ কর্মের উদ্দেশ্যের সাথে সাথে যে পন্থা অবলম্বন করা উচিত তা-ও যদি করি তবেই জীবন নির্বাহ সহজ হবে। কাজের মধ্যে খুঁজতে হবে পরম ঐশ্বর্যকে। সেই সাথে সন্তুষ্টচিত্ততাও অর্জন করতে হবে। ভিখারী হয়েও যে ব্যক্তি সংসারাসক্ত সে কর্মের মর্মার্থ বুঝতে পারেনি; সে সন্ন্যাসীর মর্যাদা পায়নি। অন্যদিকে রাজা হয়েও যিনি সংসার বিমুখ সেই প্রকৃত ঋষি বা সাধু পুরুষ মানুষ জগতকে শাসন করতে আসে। কিন্তু নিজের কর্মদোষে সে নিজেই শাসিত হয়। আমরা জগতে কাজ করতে এসেছি। অন্যের হাতের ক্রীড়নক যেন না হই সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কর্মযোগ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন- "কোন প্রকার কর্তব্য কর্মই তুচ্ছ নয়। ...প্রত্যহ আবোল-তাবোল বলে থাকেন– এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি নিজ ব্যবসায় ও কর্ম অনুসারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক জোড়া সুন্দর মজবুত জুতা প্রস্তুত করতে পারে তিনি উত্তম। প্রত্যেক কর্মই পবিত্র এবং কর্তব্য নিষ্ঠাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ... প্রত্যেক সফলকাম ব্যক্তিরই কৃতকর্মতার পশ্চাতে কোথাও অসাধারণ দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা বর্তমান।"

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, "Only busy man can give time" ব্যস্ত মানুষই পারে সময় দিতে। যাদের "কাজের মধ্যে দুই; খাই আর শুই" অবস্থা তারা কোন কাজের জন্য সময় বের করতে পারে না। সর্বদাই তারা ব্যস্ত। রসিকতা করে কেউ কেউ বলে থাকেন, "Easy কাজে Busy; Main কাজে Lazy" "সময়ের মূল্য বুঝে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি সম্পাদন না করলে অবশেষে হাপিত্যেশ ছাড়া আর কিছুই করার পথ খোলা থাকবে না। সেই বিখ্যাত প্রবাদটি কে না জানে? "Time and tide wait for none" "সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।" স্রোত যেমন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না; তেমনি সময়মত সঠিক কাজটি না করলে সে কাজ করার যথাযথ সময়ও আর পাওয়া যায় না। কথায় বলে, "সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়। ডাঃ লুৎফর রহমান বলেন, "যে জাতির মানুষ শ্রমশীল, যারা জ্ঞান সাধনায় আনন্দ অনুভব করে, তারাই জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। কর্তব্যজ্ঞানহীন, নীতিজ্ঞানশূন্য আলসে মানুষের স্থান জগতে সকলের নীচে থাকে। তারা জগতে অবজ্ঞার ভয়, অসম্মানের অগৌরব নিয়ে বেঁচে থাকে। জগতের ধন সম্পদ জয় করতে হলে, জীবনের কল্যাণ লাভ করতে হলে পরিশ্রম ও সাধনা চাই।"

আল্লাহ্পাকের সেই মহান বাণী, "যে জাতি নিজের ভাগ্যোন্নয়নে সচেষ্ট হয় না আল্লাহ্ও তাদের উন্নতিদান করেন না-" এর ব্যাখ্যাই যেন মনে হচ্ছে উপরের উদ্ধৃতিটি। পবিত্র কুরআনের সেই ঘটনা আমাদেরকে বার বার মনে করিয়ে দেয় যে, কর্মের মাধ্যমেই নিয়তি পর্যন্ত পৌছতে হয়। আল্লাহ্পাক মূসা (আঃ) কে বলেছিলেন বিজয় নির্ধারিত। শহরে যাও-যুদ্ধ কর। তাঁর অনুসারীরা বলল তুমি ও তোমার আল্লাহ্ গিয়ে যুদ্ধ কর। বিজয় যখন নির্ধারিত তা অর্জিত হলেই আমরা আসব। সেজন্য আল্লাহ্তায়ালা নির্ধারিত বিজয় পিছয়ে দিয়েছিলেন। আজ তাই আমাদেরকেও ভাবতে হবে নিজের ও নিজের দেশ ও জাতির কথা। আমার দেশের মাটিই তো সোনা। বাংলার বুকে যেকোন স্থানে বীজ গুঁজলেই চারা জন্মে-ফলন দেয়। এই অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমরা সহজেই জাতির ভাগ্যোন্নোয়ন করতে পারি। এমন উর্বর জমি ও মিঠা পানির এমন বিপুল সম্ভার আর কোথায় আছে? আমাদের নিজেদেরকে আগে চিনতে হবে। এরপরই নিজেরও ও জাতির ললাটলিপি পরিবর্তিত হবে। সেক্রেটিস তাইতো বলেছিলেন, "Know thyself" অর্থাৎ "নিজেকে জান।" সদর উদ্দিনের একটি কবিতাংশ কর্ম ও ধর্মের চমৎকার সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়।

"এ ধরণী কর্মক্ষেত্র। কর্মের বর্মপরি
তোমায় এগুতে হবে, বিধাতায় স্মরি
আপনার লক্ষ্য পানে। ওরে অন্ধ নর
জীবন ব্যয়িত কর কর্মে নিরন্তর।"

"দুনিয়ার কাজে এমনভাবে মশগুল হও যেন তুমি চিরকালই বেঁচে থাকবে এবং আখেরাতের জন্য এমনভাবে কাজ করে যাও যেন আগামীকালই তোমার মৃত্যু হবে।" এই আপ্ত বাক্য আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়ার কাজে এমনভাবে মশগুল হও যেন তুমি চিরকালই বেঁচে থাকবে এবং আখেরাতের জন্য এমনভাবে কাজ করে যাও যেন আগামীকালই তোমার মৃত্যু হবে।" এই আপ্তবাক্য আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়? দুনিয়ার কাজে এমনভাবে লিপ্ত হতে হবে যাতে সর্বশক্তি নিয়োগ হয়। কারণ আমি যদি কোনদিনই না মরি (অবশ্যই মরব) তাহলে আমার দুনিয়ার অর্থ উপার্জন বা জাগতিক অন্য সদ্গুণ (যা আমাকে সমাজে সভ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে) অর্জনে অতিমাত্রায় সচেতন হবো। মনযোগ এমনভাবে নিবদ্ধ করতে হবে যেন কাজের মধ্যেই সর্বদা ডুবে থাকা যায়। অন্যদিকে আখেরাতের কাজ এমনভাবে করব যেন কালই আমি মরে যাব। যদি কালই মরে যাই, তাহলে কোন মন্দ কর্ম করার কথা চিন্তায়ও আসতে পারে না। কর্ম ও ধর্মের এমন সুন্দর সমন্বয় মহানবী ছাড়া আর কে-ই বা দেখাতে পেরেছে। মনে রাখতে হবে ঘুমন্ত সিংহের মুখে হরিণ নিজে গিয়ে প্রবেশ করে না। তাকে ছুটে গিয়ে পরিশ্রম করে শিকার করতে হয়। যে কাজই হোক করতে হবে। কারণ কাজে লজ্জা নাই। লজ্জা হল চুরি করলে, চরিত্রহীনতা প্রকাশ পেলে। গরম লোহাতে আঘাত না হেনে আলস্য প্রদর্শন করলে পরে যেমন লোহা পিটিয়ে মনের মত আকৃতি দেয়া যায় না, তেমনি সময়মত কাজটি না করলে পরে তা করার ফলাফলও হবে তেমনি। আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন-

"হে মানুষ! হে মানুষ!
কঠোর কর্তব্য ব্রত হয়ে নিতে জীবনে তোমার
কখনো করোনা অস্বীকার
কেননা এ পথে আছে বেহেশ্তের আস্বাদ অক্ষয়
এ পথে স্রষ্টার চির সান্নিধ্য নৈকট্য মধুময়।"

জামাতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফা মুসলেহ মাওউদ হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) তাহ্রিকে জাদীদের ১৫, ১৬ ও ১৭নং মোতালেবা (দাবী) সমূহে বলেন-

(১৫) নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন (অন্যদের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে)।

(১৬) বেকার লোকেরা সম্ভব হলে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুন। সেখানে তারা রুজি অন্বেষণ করতে পারে এবং ইসলাম ও আহমদীয়তের বাণীকে প্রচার করতে পারে।

(১৭) বেকার লোকদের যে কোন চাকুরী গ্রহণ করতে ইতস্তত করা উচিত নয়।

আমরা সকলেই জানি তাহ্‌রিকে জাদীদের উদ্দেশ্য ছিল বহিঃর্বিশ্বে প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়তের বিস্তার। কিন্তু এর সাথে কর্মের সম্পর্ক কি? এ প্রশ্ন জাগাটাই স্বাভাবিক। এর সহজ উত্তর হচ্ছে, বেকারত্ব মানুষের জীবনে একটি অভিশাপ। এই বেকারত্ব বিমোচনের মাধ্যমে সময় ও অর্থ দুই'ই খোদার রাস্তায় কুরবানি করা সম্ভব। উইলিয়াম ল্যাংলয়েড বলেছিলেন-"যেখানে পরিশ্রম নেই, সেখানে সাফল্যও নেই।" সেই অতিপরিচিত প্রবাদটি কে না জানে-"Do or die" কর নয় মর।" আমৃত্যু কর্মের সাধনা করাই হচ্ছে বুদ্ধিমান লোকের কাজ। সবচেয়ে প্রথমে আমাদের শিক্ষা শুরু হয় ঘরে। আমরা ঘরের কাজগুলির অংশ নিজেরা নিই না বলে অলসতার সুপ্ত বীজগুলি হৃদয়ে বপিত হয়। আজকালকার ছেলেরা নিজেদের কাপড়-চোপড়টাও নিজে ধুতে নারাজ। ঘরের বাজার করতে হয় বৃদ্ধ পিতাদের। আমার সচক্ষে দেখা, বড় বড় ছেলেরা নির্দ্বিধায় এবং বেহায়ার মত বলছে "আব্বাকে বাজারে পাঠিয়ে দিন।" অথচ অন্যদিকে স্ত্রী নিয়ে দশটা মার্কেট ঘুরে দুইটা শাড়ি কিনতে তাদের কোন কষ্টই হয় না। দৈনন্দিন কাঁচা বাচার না করতে যাওয়াটা আজকালকার তরুণদের হয়েছে একটা ফ্যাশান। ঘরের যৎসামান্য কাজের অংশও যদি না নেয়া হয় তাহলে নিজের মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্মে না। যেমন- নিজের বিছানা, পড়ার টেবিলটা গুছানো ইত্যাদি। সৈনিকরা সবসময় নিজেদের কাজ নিজেরা করে বিধায়ই যেকোন সময় যেকোন কঠিন কাজের জন্য তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। আর অন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার অনেক অসুবিধাও আছে। সময়মত ঐ নির্ভরশীল ব্যক্তিকে না পাওয়া গেলে সব প্রোগ্রামই এলোমেলো হয়ে যায়। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন-"যে ব্যক্তি নিজের জন্য কিংবা পরের জন্য পরিশ্রম করতে বিমুখ, সে খোদার পুরস্কার হতে বঞ্চিত।" খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি বলেছেন-"শ্রম ব্যতীত কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়।" তাই জীবনে আলস্যকে সর্বোতভাবে পরিহার করা উচিত। তাহলেই জীবনের সকল সমস্য সমাধানের পথ অবারিত হবে। যে ব্যক্তি পরিশ্রম করতে জানে সে অন্যের সাহায্যের জন্য চেয়ে থাকবে না। পরিশ্রমী ব্যক্তির দেহ সুস্থ থাকে, মন থাকে স্বচ্ছ এবং আর্থিকভাবেও সে হয় সংগতিসম্পূর্ণ। আমরা যারা মুসলমান, তারা দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস রাখি যে, রিযিকের মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্‌র আরেক নাম "রাজ্জাক।" আল্লাহ্ যখন আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তখন আমাদের রিযিকের ব্যবস্থাও কোন না কোন দরজায় (স্থানে) রেখেছেন। আমাদের উচিত প্রতিটি দ্বারে (সম্ভাবনায়) করাঘাত করা। বিফল হলেও চেষ্টায় লেগে থাকতে হবে। অবশেষে নির্ধারিত দরজাটি উন্মোচিত হবেই। তবে লক্ষ্যচ্যুত হলে পুনর্বার সাহসে বুক বাঁধাও কষ্ট কর। কিন্তু সেজন্য খোদার দরবারে কান্নাকাটি করতে হবে। আমরা হযরত আলী (রাঃ)-এর সেই কথাটি কেন ভুলে যাই "অলসতার প্রতি আত্মসমর্পণ করার অর্থ নিজের অধিকার থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হওয়া।" আর আলস্য যে শুধু আমারই ক্ষতি করছে তা নয়, বরং তা সমাজের জন্যও ক্ষতিকর সাব্যস্থ হতে পারে। কেননা, আলস্য সংক্রামক ব্যাধির মত। হাদিসে বর্ণিত আছে, "শক্তিসম্পন্ন ও কাজে সক্ষম হয়েও যে নিজের জন্য পরিশ্রম বা অপরের কোন কার্য সম্পাদন করে না, আল্লাহ্ তার উপর প্রসন্ন নয়।" কাজের মাধ্যমে যে শুধু আর্থিক চাহিদা মিটবে তাই নয়, উপরন্তু সর্বোচ্চ মেধা প্রয়োগের ফলে মানুষের মনুষত্বেরও বিকাশ ঘটবে। তাই কোন কাজকেই অবহেলা না করে কাজের মাধ্যমে জীবনকে সুচারুরূপে সচল প্রবাহমান রাখতে হবে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেছিলেন-"ভিক্ষা করার চেয়ে যে কোন সামান্য পেশাও শ্রেয়। উপনিষদে বর্ণিত আছে-"শ্রম বিনা শ্রী হয় না" তারাকুমার অত্যন্ত সুন্দরভাবে কার্যে সফল হওয়ার পথ দেখিয়েছেন-

"নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, অলসতা আর রোষ,
কার্যে বৃথা কাল ব্যয়-এই ছয় দোষ
অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে যে জন
এভাবে লভিতে লক্ষ্মী আছে যার মন।"

আমাদের কর্ম হবে আমাদের ধর্মের সহযোগী প্রতিযোগী নয়। অর্থাৎ আমাদের কার্যক্ষেত্রে নৈতিকতার চরম ছাপ থাকতে হবে। খোদারই খাতিরে শুধু কর্ম করে যেতে হবে। কর্ম করতে হবে নিরন্তর কিন্তু সেই সাথে দরগাহে এলাহীতে সর্বদা সিজদাবনত হয়ে থাকতে হবে। রুহ যেন সর্বাবস্থায় সিজদাগাহে পড়ে থাকে। তাহলেই পৃথিবীর সৃষ্টি ও পরকালের হিসাব দুই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে-জীবন হবে সহাস্যমধুর ফুলেল এবং সাফল্যময়। আহমদী জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) বলছিলেন- "বীজ বপনের পর চেষ্টা তদবীর না করলে কেবল দোয়া করা এক ধরনের শিরক।" পুরোমাত্রায় চেষ্টা করতে হবে, তারপর দোয়া করতে হবে। তবে এটা প্রকৃত ঈমানের সারকথা। অতঃপর যা পাওয়া যাবে তা আল্লাহ্‌র রহমতে পাওয়া যাবে।" অবশেষে হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এর কিশ্‌তিয়ে নূহ থেকে কর্ম ও ধর্মের সমন্বয় সাধনের সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করে এ নিবন্ধ শেষ করছি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন। তিনি বলেন ঃ

"সীমার মধ্যে থেকে উপকরণ অবলম্বন করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি না বরং তাথেকে নিষেধ করি যে, অন্যান্য জাতির মত তোমরা শুধু উপকরণের দাসে পরিণত হও এবং সেই খোদাকে ভুলে যাও যিনি সেই উপকরণগুলেরও ব্যবস্থা করে থাকেন। তোমাদের যদি দেখে থাক তাহলে দেখতে পাবে যে, খোদাই খোদামাত্র, অবশিষ্ট বাকী সবকিছুই তুচ্ছ। তাঁর অনুমতি ছাড়া তোমরা হাতকে প্রসারিত করতে পার না, গুটাতে পার না। ... আমি তোমাদেরকে পার্থিব উপার্জন ও কলা কৌশল শিখতে নিষেধ করি না। কিন্তু তোমরা ঐসব লোকের অনুগামী হয়োনা যারা এই সংসারকেই সবকিছু মনে করে।' এ সাংসারিক বা প্রারম্ভিক সব কাজেই তোমাদের খোদা হতে ক্রমাগত শক্তি ও সামর্থ্য প্রার্থনা করতে থাকা উচিত কিন্তু তা কেবল শুষ্ক ঠোঁট দিয়ে উচ্চারণ করে নয়, বরং প্রার্থনাকালে সত্যি সত্যিই যেন এই বিশ্বাস থাকে যে, প্রত্যেক বরকত আকাশ হতেই অবতীর্ণ হয়। তোমরা সত্যবাদী বলে তখনই গণ্য হবে, যখন প্রত্যেক কাজে এবং বিপদের সময়ে কোন তদ্‌বীর করার পূর্বে আপন গৃহদ্বার বন্ধ করে খোদার দরবারে প্রণত হয়ে বলবে, 'হে প্রভু! আমি বিপদে পড়েছি, তুমি আপন অনুগ্রহে আমাকে বিপদমুক্ত কর। তখন রুহুল কুদ্দুস (পবিত্র আত্মা) তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং গায়েব হতে কোন পথ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। ... কখনও এটা মনে করো না যে, তাহলে অন্যান্য জাতি কিভাবে কৃতকার্য হচ্ছে। যদিও তারা তোমাদের কামেল ও সর্বশক্তিমান খোদা সম্পর্কে কিছুই অবগত নয়? এর উত্তর হচ্ছে, তারা খোদাকে পরিত্যাগ করায় এক পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে। খোদাতায়ালার পরীক্ষা কখনও এরূপ হয়ে থাকে যে, যে ব্যক্তি তাঁকে পরিত্যাগ করে পার্থিব আমোদ ও সুখ সম্ভোগে মত্ত হয় এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়, তখন তার জন্য পৃথিবীর দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও উলঙ্গ হয়ে যায়। অবশেষে পার্থিব দুঃশ্চিন্তাতেই তার মৃত্যু ঘটে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। ... যারা খোদার কিতাবে প্রকৃত জ্ঞান ও দর্শন অনুসন্ধান করেছে তারাই সফলকাম হয়েছে। ... কিন্তু এসবের জন্য সর্বপ্রথম পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও সরলতা প্রয়োজন। তবেই এর পর এই সব কিছুই তোমরা লাভ করবে।" (শেষ)

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

এম. টি. এ. ডাইজেস্ট

তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সতর্কবাণী ঃ

বিগত কয়েক মাসে কয়েকবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন মহাদুর্যোগ সমাগত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন সেসব বর্ণনা তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হয়। নিম্নে এরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল।

বসনিয়ার ভবিষ্যত সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (রাহেঃ) বলেন, বসনিয়ান জাতি যদি দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির মাঝে নিজেদের হারিয়ে ফেলে তবে চলবে না, বরং তাদের দায়িত্ব প্রবাস থেকে নিজ দেশের প্রতি ভালবাসাকে জীবন্ত রাখা। ইহুদী জাতির থেকেও এখানে শিক্ষা নেয়ার আছে। দুই হাজার বছর তারা যেটাকে পবিত্র ভূমি মনে করতো সেই জেরুজালেম থেকে তারা দূরে ছিল। বহু অত্যাচারেও তারা এর ভালবাসাকে ত্যাগ করেনি। ফলস্বরূপ তারা সেখানে নিজেদের রাষ্ট্র পেয়েছে। বসনিয়ানদের তো দুই হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে না। বড় জোড় বছর পঁচিশেক। এর মধ্যে দুর্যোগময় অবস্থার মধ্য নিয়ে বিশ্ব রাজনীতির পট পরিবর্তন হবে, আর তখন তাদেরকে নিজ দেশ থেকে কেউ বঞ্চিত রাখতে পারবে না।

আরেকটি অনুষ্ঠানে ফরাসী ভাষাভাষী এক বালক প্রশ্ন করে যে, আজ থেকে বিশ বছর পরে বিশ্বের কোন এলাকার জনবসতি সবচেয়ে ঘন হবে অথবা জনসংখ্যা বিন্যাস কেমন হবে। হুযূর (রাহেঃ) এর উত্তরে বলেন যে, এটা তো বলা কঠিন তবে এটুকু বলা যায় যে, এমন কোন কোন এলাকা থাকবে যেগুলো ভয়াবহ ধ্বংযজ্ঞে জনশূন্য হয়ে পড়বে।

তেমনি এক পাকিস্তানী ব্যক্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদ ও সম্পদ সরিয়ে ফেলার বিষয়ে পরামর্শ চাইলে হুযূর (রাহেঃ) বলেন, এখনই এরকম করলে আতঙ্ক (panic) সৃষ্টি হতে পারে আর এর ফলে অযথা সরবরাহ সংকট শুরু হবে। তাই সময় হলেই ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

এছাড়াও ১২ই মার্চের খুতবায় শেষ যুগের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও সে সময় দুরূদ পাঠের গুরুত্ব সংক্রান্ত হাদিসের আলোকে হুযূর (রাহেঃ) বর্তমান যুগে দুরূদ পাঠের উপর বিশেষ তাকিদ দেন।

মৃত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের সম্ভাবনা ঃ

মৃত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ হওয়া সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (রাহেঃ) বলেন যে, এটা অবশ্যই সম্ভব। এ ব্যাপারে নিজ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেন। হুযূর (রাহেঃ) বলেন যে, তাঁর বেগম সাহেবা হযরত উম্মুল মুমিনীন এর ইন্তেকালের পর তিনি এক পর্যায়ে খুব বিচলিত ছিলেন। এর মধ্যে অফিসে জাগ্রত অবস্থাতেই তিনি হযরত উম্মুল মু'মিনীনের উপস্থিতি অনুভব করেন। এরপর তাঁকে দেখতেও পান এবং তাঁর সাথে কথোপকথনও হয়। এটা হুযূর (রাহেঃ) এর জন্যে বড় প্রশান্তি ও সান্তনাদায়ক ঘটনা ছিল।

কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ঃ

স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সংরক্ষিত শুক্রাণু দ্বারা টেস্ট টিউবে কৃত্রিম নিষিক্তকরণের মাধ্যমে সন্তান ধারণে বৈধ কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (রাহেঃ) বলেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী যতদিন অপর কাউকে বিয়ে না করেন ততদিন তিনি তার পূর্বের স্বামীরই স্ত্রীরূপে গণ্য। তাই নিজ স্বামীর শুক্রাণু দ্বারা কৃত্রিমভাবে সন্তান ধারণ বৈধ বলে গণ্য হবে যদিও সেই স্বামী তখন জীবিত নেই। তবে অন্য পুরুষের শুক্রাণু দ্বারা অথবা অন্যত্র বিবাহ হয়ে গেলে পূর্বের স্বামীর শুক্রাণু দ্বারা সন্তান ধারণ বৈধ হবে না।

আহমদী রেডিও সেন্টার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ঃ

৩০শে এপ্রিল প্রচারিত ফরাসী ভাষায় মুলাকাত অনুষ্ঠানে হুযূর (রাহেঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি জানতে চান আহমদী জামাতের রেডিও সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিকল্পনা আছে কি না। হুযূর (রাহেঃ) বলেন, রেডিও সেন্টারের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কেননা, ডিশ এন্টেনা সবার সাধ্যের মধ্যে পড়ে না। অথচ প্রত্যন্ত ও গরীব অঞ্চলগুলোতেও আজকাল রেডিও পৌছে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সমস্যা হল এই যে, শর্ট ওয়েভে বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের জন্যে যে লাইসেন্স আবশ্যক তাতে যেসব দেশে এ সম্প্রচার পৌছবে তাদের সম্মতি প্রয়োজন, আর এটা সবাই দিবে বলে মনে হয় না। এমতাবস্থায় একটি বিকল্প চিন্তা করা হয়েছে। তা এই যে, এম.টি.এ.এর বিশ্বজনীন সম্প্রচারের লাইসেন্স আমাদের আছে। যদি এম.টি.এ.-এর সম্প্রচারকে রেডিওতে বৃহৎ এন্টেনার সাহায্য ছাড়াই শ্রবণ করা সম্ভব হয় সেই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। সম্প্রতি যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে তারা একটি Break through সৃষ্টি বা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে সমর্থ হয়েছেন এবং বছর দুয়েকের মধ্যে এ প্রযুক্তির মুখ আমরা ইনশাল্লাহ্ দেখার আশা করতে পারি।

সংকলন ঃ আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক

৮১তম ন্যাশনাল সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ কৃপা ও দয়ায় গত ১১, ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি '২০০৪ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ৮১তম ন্যাশনাল সালানা জলসা। এতে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশেরই কৃতী সন্তান মুরব্বী সিলসিলাহ আলীয়া আহমদীয়া মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। হযরত আকদাস খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আইঃ) বাংলাদেশ জামাতের জন্য বাণী প্রেরণ করেন এবং ১১ইং ফেব্রুয়ারির জুমুআর খুতবার শেষাংশে (সানী খুতবায়) বাংলাদেশ জামাতের জলসার বিষয়ে কথা বলেন।

১১ই ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩.০০টায় হুযূর (আইঃ) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা আলহাজ আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব তৌফিক আহমদ। হুযূর (আইঃ) এর বাণী পাঠ করে শুনান জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী, সেক্রেটারী জলসা কমিটি। এরপর উদ্বোধনী ভাষণ দেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন হুযূর আকদাস (আইঃ) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। এরপর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি মহলের সম্মানিত অতিথিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। যথাক্রমে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলী" ও "মহানবী (সঃ) এর পবিত্র জীবনাদর্শ" শীর্ষক বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধরী ও অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী সাহেব।

১১ই ফেব্রুয়ারি সকাল ৯.৩০ টায় মোহতরম মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান। এরপর উর্দু নযম পেশ করেন জনাব এনামুর রহমান। মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন হুযূর আকদাস (আইঃ)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। এরপর "কুরআন শরীফ এক অভূতপূর্ব ঐশী নিয়ামত" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। এরপর একটি বাংলা নযম পেশ করেন জনাব জি. এম. সাব্বির আহমদ। "ইসলামে নারীর মর্যাদা ও দায়িত্ব" ও "একামাতে সালাত" বিষয়ে যথাক্রমে বক্তব্য রাখেন ডঃ তারেক সাইফুল ইসলাম ও মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

১১ই ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩.০০টায় মোহতরম ডঃ তারেক সাইফুল ইসলাম নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ এর সভাপতিত্বে জলসার তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয়। প্রথমেই পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন ক্বারী মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব এস. এম. আরমান। এ পর্যায়ে বুদ্ধিজীবিদের প্রতিনিধি দল বক্তব্য রাখেন। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর সত্যতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। এরপর জনাব ইব্রায়েতুল হাসান সাহেব একটি বাংলা নযম পেশ করেন। এরপর "ইসলাম ও মানবাধিকার" ও "আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কয়েকটি আপত্তির খন্ডন" বিষয়ে যথাক্রমে বক্তব্য রাখেন এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব ও সাবেক ন্যাশনাল আমীর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব।

জলসার ৪র্থ অধিবেশন শুরু হয় ১৩ই ফেব্রুয়ারি সকাল ৯.৩০ টায়। সভাপতিত্ব করেন মোহতরম নাজির আহমদ সাহেব, আমীর, চট্টগ্রাম। পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা হাফেয মুজিবুর রহমান। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব মনির আহমদ ভূঁইয়া। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। এরপর একটি উর্দু নযম পেশ করেন জনাব জাকির হোসেন। এ পর্যায়ে "যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন সম্ভব নয়" ও "আহমদীয়া জামাতে আর্থিক কুরবানি ও ওসীয়্যত ব্যবস্থা" বিষয়ে যথাক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব মাহবুবুর রহমান, সদর-খোদ্দামুল আহমদীয়া ও মাওলানা বশিরুর রহমান সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান, সাহেবের সভাপতিত্বে ১৩ই ফেব্রুয়ারি, বিকাল ৩.০০টায় অনুষ্ঠিত হয় জলসার সমাপনী অধিবেশন। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মসিহ্ উর রহমান। দ্বৈত কণ্ঠে উর্দু নযম পেশ করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয় ও জনাব সিবগাতুর রহমান মুকুল। আহমদীয়া জামাতের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান। বাংলা নযম পেশ করেন জনাব জিকরে এলাহী। "খিলাফত ইসলামী ঐক্যের একমাত্র পন্থা" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন হুযূর আকদাস (আইঃ) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) এর স্মরণে বক্তব্য রাখেন, জনাব আব্দুল খালেক বাঙালি। সবশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সমাপনী বক্তব্য রাখেন ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি করেন।

- সিবগাতুর রহমান মুকুল

৪র্থ বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাস ০৪ অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পন্ন

মহান আল্লাহ্‌তায়ালা অশেষ ফযলে ৪র্থ বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাস '০৪ চট্টগ্রাম বিভাগ-১ গত ২৪/১২/০৪ইং হতে ৩০/১২/০৪ইং পর্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়

মৌড়াইলস্থ সৈয়দ সালেহ আহমদ সাহেবের বাড়িতে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

উক্ত ক্লাসে চট্টগ্রাম বিভাগ-১ অঞ্চলের ১০টি জামাত বৃহত্তর ঢাকা বিভাগ-এর ২টি জামাত এর ওয়াকফে নও ও তাদের পিতা মাতা অংশগ্রহণ করে।

জামাতসমূহ হচ্ছে বি.বাড়িয়া, ঘাটুরা, তারুয়া, ক্রোড়া, তালশহর, শাল-গাও, বাশারুক, দূর্গারাম-পুর, আখাউড়া, জামালপুর জামাত এর ৬৫ জন ও বৃহত্তর ঢাকা বিভাগের হোসনেবাদ ও ঢাকা জামাতের ওয়াকফে নও সহ সর্বমোট ৬৭ জন ওয়াকফে নও ও ৩০ জন পিতামাতা অংশগ্রহণ করে ক্লাস করেন। প্রত্যেক দিন সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শিশু ও পিতামাতাকে ক্লাস করানো হয়।

৭দিন ব্যাপী ক্লাসের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার, বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, নাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এবং মোহতরম মঞ্জুর হোসেন; আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বি.বাড়িয়া, মোহতরম খন্দকার সাঈদ আহমদ, সাহেব আমীর, বি.বাড়িয়া এবং মোহতরম সৈয়দ আব্দুল হান্নান, সাবেক যয়ীমে আলা, ঢাকা। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহাতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম মঞ্জুর হোসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার, বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, চট্টগ্রাম বিভাগ।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার
বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও
চট্টগ্রাম বিভাগ

শুভ বিবাহ

জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম মিয়া এর কন্যা মোছাম্মদ ময়না বেগম সাং- বিষ্ণুপুর এর সাথে জনাব মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান ভুঁইয়া এর পুত্র মোহাম্মদ শফিকুল আলম ভুঁইয়া সাং- বিষ্ণু-পুর,ডাকঘর- বিষ্ণুপুর, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫০,১০১(পঞ্চাশ হাজার একশত এক টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ২৭-৮-২০০৪ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিষ্ণুপুর এর কন্যার পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা সাদেক আহমদ মোয়াল্লেম সিলসিলাহ্‌। কেন্দ্রীয় রিস্‌তানাতা কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৪৬০/০৪ তারিখ ২৬.০৯.০৪। এই বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে অনুরোধ কর যাচ্ছে।

মোহাম্মদ শাহজাহান ভূঁইয়া
প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বিষ্ণুপুর

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমার আম্মাজান মিসেস আরফিনা বেগম গত ১১ই জানুয়ারী রোজ মঙ্গলবার রাত ১১.১০ মিনিটে ময়মনসিংহ হাসপাতালে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর। মরহুমার জানাযার নামায পড়ান ময়মনসিংহ জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আজহার আলী সাহেব এবং সেখানেই তাঁর দাফন কার্য সম্পন্ন হয়। তিনি ছিলেন পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা সন্তানের জননী। এছাড়া তিনি নাতি-নাতনী, আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি ময়মনসিংহ জামাতের শহীদ আরফান আলী মুন্সীর বড় মেয়ে ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি অনেক দুঃখ দুর্দশার মাঝে এ সত্য পথকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত লাভের জন্য এবং জান্নাতে সম্মানিত স্থান লাভের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি এবং মহান আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাদের পরিবারবর্গকে সাবরে জামিল দান করেন সেই জন্যও সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

বদরুল ইসলাম
ইসলামগঞ্জ জামাত

■ অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, বাশারুক জামাতের মরহুম মৌলবী রহমত আলী সাহেবের ছোট ছেলে জনাব রশিদ আহমদ (মেম্বার) গত ২৬/১/০৫ইং তারিখ রোজ বুধবার বিকাল ৪.০৫ মিঃ ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে ...রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। তাঁর রূহের মাগফেরাত ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের কল্যাণের জন্য সকল আহমদী ভাই-বোনদের নিকট খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ছবির আহমদ
বাশারুক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

■অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, রংপুর জামাতের মরহুম বদির উদ্দিন উকিল সাহেবের জ্যৈষ্ঠ ছেলে জনাব আব্দুল খালেক সাহেব গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ শুক্রবার সকাল ৭ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ...রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তাঁর রূহের মাগফেরাত ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের কল্যাণের জন্য সকল আহমদী ভাই-বোনদের নিকট খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- আনোয়ারা মোস্তাফিজ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের ২দিন ব্যাপী ২৫তম সালানা জলসার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রাম এর ২ দিন ব্যাপী ২৫তম সালানা জলসা গত ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি চকবাজারস্থ বায়তুল বাসেত মসজিদ কমপ্লেক্সে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য আধ্যাত্মিক প্রীতিপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশে বিকাল ২.৩০ মিনিট থেকে কুরআন তেলাওয়াত ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে শুরু ও সমাপ্ত হয়। সালানা জলসার তিনটি অধিবেশনে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)-এর বিশেষ প্রতিনিধি মাওলানা ফিরোজ আলম, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোবাশ্‌শের উর রহমান ও চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আমীর আলহাজ্ব নাজির আহমদ প্রমুখ সভাপতিত্ব করেন। এতে বিভিন্ন কুরআন তেলাওয়াত করেন যথাক্রমে আনোয়ার আহমদ, হাফেজ ডাঃ আনোয়ার হোসাইন ও মোয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ সুমন। নযম পরিবেশন করেন সর্বজনাব আব্দুল ওয়াহেদ, তৌফিক আহমদ, এনামুর রহমান নাসের ও সেলিম আহমদ।

বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতা পর্বে সালানা জলসার গুরুত্ব, খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা, পশ্চিমবঙ্গে আহমদীয়তের প্রচার ও বিকাশ, মানব সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ইসলামী অর্থনীতি এবং ওসীয়ত ব্যবস্থাপনা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, স্মৃতিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ) স্মৃতিতে ফালু মিয়া প্রভৃতি বিষয়ে সর্বজনাব মাওলানা ফিরোজ আলম, মাওলানা সালেহ আহমদ, মাশরেক আলী মোল্লা (আমীর, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম) মাওলানা বশীরুর রহমান, মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আবদুল খালেক বাঙ্গালী ও নুরুদ্দীন আহমদ জ্ঞানগর্ভ ও প্রাণ সঞ্চারী বক্তৃতা করেন। সমাপনী অধিবেশনে সম্মানীত বিশেষ অতিথি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ডাঃ জামাল নজরুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রয়াত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর আব্দুস সালামের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও হৃদ্যতার কথা বর্ণনা করেন। ২দিন ব্যাপী সালানা জলসায় জলসা কমিটির চেয়ারম্যান, নায়েবে আমীর ও জেনারেল সেক্রেটারী শুকরিয়া জ্ঞাপন বক্তৃতা করেন। সালনা জলসায় বহু পুণ্যবান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী-গুণী, শিল্পপতি, সাহিত্যিক ও আলেমগণের উপস্থিতি ছিল দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার মত। এখানে উল্লেখ্য যে, জলসার খবরা খবর স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় শিরোনাম আকারে ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

- খালিদ মাহমুদ সিরাজী
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম

তাহ্‌রিকে জাদীদের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশে তাহ্‌রিকে জাদীদের ২০০৩-২০০৪ সালের চাঁদা আদায়কারীদের সম্পর্কে হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আইঃ)-এর দফতর হতে ওকালাতে মাল ভি.এম. ১৬৬৮ তারিখ ১৮.১১.২০০৪ইং সংখ্যক চিঠিতে জানাচ্ছেন যে,

'মোকাররম ও মোহতরম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

তাহরিকে জাদীদের শতভাগ আদায়কারীদের তালিকা হুযূর আনওয়ার (আইঃ) দেখেছেন এবং দোয়া করেছেন ঃ "আল্লাহ্‌তায়ালা সবার সম্পদে অগণিত বরকত দান করুন"

জাযাকুমুল্লাহো আহসানাল জাযা।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার

এডিশনাল ওয়াকিলুল মাল, লন্ডন।

বিঃ দ্র ঃ ২০০৪-২০০৫ সালে তাহ্‌রিকে জাদীদ খাতে সকল স্থানীয় জামাতের সকল আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, আতফাল, নাসেরাত, শিশুদের এবং সকল নও মোবইনদের (সদ্য আহমদীয়া জামাতে বয়াতকারীদের) ওয়াদা করিয়ে তাদের তালিকা কেন্দ্রে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খেদমতে এবং ওয়াদাকারীদের নিকট হতে চাঁদা আদায় করে কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তাহ্‌রিকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

মজলিস সংবাদ

■গত ২৮/০১/০৫ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র জয়ীমে আলা জনাব বোরহানুল হক এর সভাপতিত্বে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফতুল্লার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মুসলিম উদ্দিন সাহেব, সভায় সদস্যদের চাঁদা, বাজেট এবং তবলীগ সম্পর্কিত আলোচনা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব কামাল পাশা সাহেব সভায় উপস্থিত ছিলেন।

■আল্লাহ্‌র অশেষ ফযলে বিগত ১০ জানুয়ারি হতে ১৪ইং জানুয়ারি ২০০৫ইং তারিখ পর্যন্ত বরিশাল জোনের ৫ম বার্ষিক ওয়াকফে নও পিতা-মাতা তালীম তরবীয়ত ক্লাস ও সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামাত কৃষ্ণনগরে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেব (ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ) শিক্ষক হিসেবে ছিলেন মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মৌঃ নাসের আহমদ আনসারী , মৌঃ ইদ্রিস আহমদ, মৌঃ শাহ আলম ও মৌঃ আলী আহমদ মাষ্টার।

- শফিকুল ইসলাম

The AHMADI Bulletin 28 February, 2005
(Published for Talim and Tarbiyyat for the members of Ahmadiyya Muslim Jamaat)

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য করা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে. কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন ? এইরূপ ই'তিকাফ যে-

ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;

খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং

গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এ কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।

কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী (রাঃ)-এর মাঝে হযরত মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-কে দেখা যাচ্ছে।

সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ মাহবুব হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশাআত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকসি বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মুদ্রিত
Printed and Published by Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211